ড. আলি মুহাম্মাদ সাল্লাবি

উৎপত্তি, চিন্তাধারা ও ক্রমবিকাশ

কাজী আবুল কালাম সিদ্দীক
অনূদিত

খারেজি

[উৎপত্তি, চিন্তাধারা ও ক্রমবিকাশ]

সূ চি প ত্র

দ্বিতীয় অধ্যায় : আলি রা.-এর জীবনের শেষ দিনগুলো ও শাহাদত

ভূমিকা

إِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا، وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلِ اللهُ فَلاَ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَّ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ

নিশ্চয় সব প্রশংসা আল্লাহর জন্য; আমরা তাঁর প্রশংসা করি, তাঁর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করি এবং তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি; আর আমাদের নফসের জন্য ক্ষতিকর এমন সকল মন্দ প্রবৃত্তি এবং আমাদের সকল প্রকার মন্দ কাজ থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাই। আল্লাহ যাকে পথ প্রদর্শন করেন কেউ তাকে পথভ্রষ্ট করতে পারে না; আর তিনি যাকে পথহারা করেন কেউ তাকে পথ দেখাতে পারবে না। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি—আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই। তিনি একক। তাঁর কোনো অংশীদার নেই এবং আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি—মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর বান্দা ও রাসুল।

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ﴾

'হে ইমানদারগণ, তোমরা যথাযথভাবে আল্লাহকে ভয় করো। মুসলিম থাকা অবস্থায় ছাড়া যেন তোমাদের মৃত্যু না হয়।' *-সুরা আলে ইমরান : আয়াত ১০২।*

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾

> ‘হে মানবজাতি, তোমাদের রবকে ভয় করো। তিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন একটি প্রাণ থেকে। আর সেই একই প্রাণ থেকে সৃষ্টি করেছেন তার জোড়া। তারপর তাদের দুজনার থেকে সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে দিয়েছেন বহু পুরুষ ও নারী। সেই আল্লাহকে ভয় করো, যার দোহাই দিয়ে তোমরা পরস্পরের কাছ থেকে নিজেদের হক আদায় করে থাকো এবং আত্মীয়তা ও নিকট-সম্পর্ক বিনষ্ট করা থেকে বিরত থেকো। নিশ্চিতভাবে জেনে রেখো, আল্লাহ তোমাদের ওপর কড়া নজর রেখেছেন।’ *-সুরা নিসা : আয়াত ১।*

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ۝ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾

> ‘হে ইমানদারগণ, আল্লাহকে ভয় করো এবং সঠিক কথা বলো। আল্লাহ তোমাদের কার্যকলাপ ঠিকঠাক করে দেবেন এবং তোমাদের অপরাধসমূহ মাফ করে দেবেন। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের আনুগত্য করে সে বড় সাফল্য অর্জন করে।’ *-সুরা আহজাব : আয়াত ৭০-৭১।*

হে আমার প্রতিপালক, সমুদয় প্রশংসা আপনার জন্যই। এমন প্রশংসা যা আপনার চেহারার বড়ত্ব ও মর্যাদা এবং আপনার পরিপূর্ণ যোগ্যতার স্মারক বহন করে। আপনি যখন রাজি থাকেন তখনও আপনার প্রশংসা; সন্তুষ্টির পরও আপনারই প্রশংসা।

হামদ ও সালাতের পর :

খারেজিদের বিষয়ে একটি তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ নিয়ে আলোচ্য গ্রন্থটি রচিত। এতে খারেজি সম্প্রদায়ের প্রকৃতি, ইতিহাস এবং তাদের নিন্দায় নববি বাণী, হারুরায় তাদের দলত্যাগী মনোবৃত্তি, তাদের সাথে হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা.-এর বিতর্ক-মুনাজারা, তাদের সাথে আমিরুল মুমিনিন হজরত আলি বিন আবি তালিব রা.-এর আচরণ, তাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের নেপথ্য কারণ নিয়ে আলোচনা করেছি।

এ ছাড়া আমিরুল মুমিনিন হজরত আলি রা.-এর যুগে তাদের কুকীর্তি যেমন—ধর্মে বাড়াবাড়ি, দীন সম্পর্কে উদাসীনতা, মুসলিম শাসকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা, কবিরা গুনাহকারী মুসলমানকে কাফের বলা, মুসলমানদের হত্যা ও তাঁদের সম্পদকে হালাল ঘোষণা করা, নির্বিচারে গালিগালাজ করা, তাঁদের প্রতি কুধারণা পোষণ করা, মুসলমানকে কাফের বলা, কতেক সাহাবিকে গালমন্দ ও নিন্দা করা এবং হজরত উসমান ও আলি রা.-কে কাফের সাব্যস্ত করা—ইত্যাদি বিষয়েও আলোচনা করা হয়েছে।

নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাআলার নৈকট্য অর্জনের নিমিত্তে কুরআন ও সুন্নাহ প্রদর্শিত মূলনীতি হলো হকের উন্মোচন ও বাতিল চিন্তাধারার খণ্ডন। মূল মানহাজ তথা কুরআন-সুন্নাহ দ্বারা আহলে সুন্নাত ওলামায়ে কেরাম, ফকিহ ও আল্লাহর পথে আহ্বানকারীদের মাধ্যমে ইসলামের বিশুদ্ধ বোধ, বিবেচনা ও চিন্তাধারা অর্জন করা সম্ভব।

সুতরাং দীনের উন্নয়ন ও অগ্রগতির লক্ষ্যে কাজ করা আমাদের জন্য আবশ্যক। আমাদের সৌভাগ্যের বিষয় এটা নয় যে, আমরা দ্রুত এর সুফল পাব; বরং প্রকৃত সৌভাগ্য হচ্ছে আল্লাহ আমাদের এর তাওফিক দিয়েছেন—এই বোধ এবং আমরা এর দ্বারা ইসলামকে বুঝব ও আল্লাহর সন্তুষ্টি আশা করব। আল্লাহ তাআলা এ কাজে বরকত দান করুন। এর দ্বারা ইসলামের পথে আহ্বানকারী ওইসব ভাইদের উপকৃত করুন; যাদের নাম আমরা জানি না। কিন্তু তাঁদের দাওয়াতের প্রভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে যুগ যুগ ধরে। তাঁরা মুসলিম জাতিকে সবধরনের বাধা-বিপত্তি থেকে মুক্তির প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন। তাঁরা ওইসব নিবেদিতপ্রাণ ব্যক্তি—যাঁরা সত্যকে চেনেন এবং নিজেদের দুর্বলতা ও অসহায়ত্ব সত্ত্বেও সত্য প্রতিষ্ঠা ও সুরক্ষায় লড়াই চালিয়ে যান সন্তুষ্টচিত্তে। দীনের প্রতি একনিষ্ঠ মনোভাব ও হৃদ্যতা এবং রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে পরিপূর্ণ অনুসরণ করায় আল্লাহ তাআলা তাঁদের হেদায়াত দান করেছেন।

আল্লাহ তাআলা এই গ্রন্থের মাধ্যমে ওইসব আলেম ও তালিবে ইলমদের উপকৃত করুন; যাঁদের কলমের কালি শহিদি রক্তের সমতুল্য। ওইসব ব্যবসায়ীদের উপকৃত করুন; যাঁরা নিজেদের জান-মাল ইসলামের প্রচার-প্রসারে ব্যয় করেন। যারা বলে—

﴿لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا ۝ إِنَّا نَخَافُ مِن رَّبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا﴾

'তোমাদের কাছে কোনো প্রতিদান ও কৃতজ্ঞতা কামনা করি না। আমরা আমাদের পালনকর্তার তরফ থেকে এক ভীতিপ্রদ ভয়ংকর দিনের ভয় রাখি।' *-সুরা দাহর : আয়াত ৯-১০।*

পৃথিবীর বুকে তাঁরা এমনই অপরিচিত বাহিনী। কিন্তু পরকালের চিরন্তন জান্নাতি কাননে তাঁরা একেকজন মহান অতিথি।

আমরা এমন এক যুগে বসবাস করছি, যেখানে তুমুল ঘূর্ণিঝড় চলছে ইসলাম ধ্বংসের। আমাদের দীন ও আকিদা নির্মূলে চলছে চতুর্মুখী ষড়যন্ত্র। ক্রুসেডার, ইহুদি, বাতেনি, বেদআতি ও সেকুলারিজমের একনিষ্ঠ সমর্থকদের মতো ইসলামের শত্রুরা আমাদের শাসকশ্রেণি, নেতৃবৃন্দ ও আকাবিরগণকে জ্ঞান-বিজ্ঞান, সভ্যতা, শিষ্টাচার ও রাজনীতির মাঠে কোণঠাসা করে রেখেছে। তারা একযোগে আমাদের সোনালি ইতিহাসের রিকৃতি সাধনে আদাজল খেয়ে নেমেছে। আমাদের গৌরবময় ইতিহাস যদি মুছে ফেলা যায়, তবে নেতৃত্বশীল সংস্কারবাদী জাতি গঠনের কোনো উপাদান থাকবে কি আমাদের? বিশ্বজুড়ে সমাদৃত মুসলিম মনীষীগণের নাম-নিশানা যদি মুছে ফেলা যায়, কোনো মূল্য কি আর আমাদের অবশিষ্ট থাকবে? সুতরাং আমাদের উচিত, আমাদের গৌরবোজ্জ্বল সোনালি অতীত হতে শিক্ষা নেওয়া। যে ইতিহাস মুসলমানদের সামনে শত্রুদের মাথা নোয়ানোর। যে ইতিহাস অশুভ চিন্তার ধারকদের ষড়যন্ত্র নস্যাতের। আমরা কি সেই হারানো দাওয়াতি ইতিহাস ফিরিয়ে আনতে এবং সেই সভ্যতা-সংস্কৃতি পৃথিবীর বুকে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করতে উদ্যোগী হব না?

বর্তমানে এমন এক শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতি বিদ্যমান, যেখানে মানবতা আল্লাহর বাতানো পথ থেকে বিচ্যুত হওয়ায় পৌঁছে গেছে অধঃপতনের অতল গহ্বরে। অথচ তাদের ব্যাধির নিরাময় রয়েছে মুসলমানদের কাছে। কিন্তু তারা কি আত্মত্যাগে প্রস্তুত? আত্মরক্ষা এবং অন্যকে বাঁচানোর মানসিকতা কি আমাদের আছে?

আবারও ইসলাম ফিরে আসুক তার মূলে। সকলের হৃদয়ের পঙ্কিলতা সে দূর করে দিক। ইসলাম পুনরায় আমাদের উত্তম চরিত্রে শক্তি যোগাক। আমাদের মিলিয়ে দিক কুরআনের সাথে। ইসলামের নবি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর দীনের সাথে সম্পৃক্ত করে আমাদের সৌভাগ্যমণ্ডিত করুক। ইসলাম যেন আমাদের এই বোধে উদ্বুদ্ধ করে তুলে যে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাওয়াত এবং খুলাফায়ে রাশেদিন তথা আবু বকর, উমর, উসমান ও আলি রা.-সহ অন্যান্য সাহাবায়ে কেরামের আদর্শের ওপর আমল করা আমাদের জন্য অপরিহার্য; যাতে আমরা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রিসালাতের প্রচার-প্রসার ও তাকে শক্তিশালী করতে ঐক্যবদ্ধভাবে একযোগে কাজ করে যেতে পারি।

বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটি আমি ১১ শাওয়াল ১৪৩৫ হিজরি (৭ আগস্ট ২০১৪ খ্রি.) বৃহস্পতিবার দুপুর ১২টা ৫৫ মিনিটে লেখা শেষ করি। সর্বাবস্থায় আমি আল্লাহর কাছে তাঁর সুন্দর নাম ও উন্নত গুণাবলির মাধ্যমে দুআ করি; তিনি যেন এ কাজকে কবুল করেন। এই গ্রন্থ থেকে সবাইকে উপকৃত করেন। নিজ অনুগ্রহ ও দয়া দ্বারা এতে বরকত দেন।

এই ভূমিকার শেষ পর্যায়ে এসে আমি আল্লাহর কাছে কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করছি—তিনি যেন আমার এ কাজ কেবল তাঁর সন্তুষ্টির জন্য কবুল করেন। বানিয়ে দেন তাঁর বান্দাদের উপকারের পাথেয়। এ গ্রন্থের প্রতিটি বর্ণের বিনিময়ে উত্তম বদলা দান করেন। যারা এ কাজে সহযোগিতা করেছেন সবাইকে কবুল করেন। আমি প্রতিটি মুসলমানের কাছে অনুরোধ করছি—যারা এ গ্রন্থটি অধ্যয়ন করবেন, তাঁরা যেন তাঁদের দুআয় আমাকে অন্তর্ভুক্ত করে নেন। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّذِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ ﴾

‘হে আমার রব, আমাকে নিয়ন্ত্রণে রাখো, আমি যেন তোমার এ অনুগ্রহের শোকর আদায় করতে থাকি, যা তুমি আমার প্রতি ও আমার পিতা-মাতার প্রতি করেছ এবং এমন সৎকাজ করি, যা তুমি পছন্দ করো এবং নিজ অনুগ্রহে আমাকে তোমার সৎকর্মশীল বান্দাদের দলভুক্ত করো।’ *-সুরা নামাল : আয়াত ১৯।*

﴿مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَّحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا ۖ وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِن بَعْدِهِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾

'আল্লাহ যে রহমতের দরজা মানুষের জন্য খুলে দেন, তা রুদ্ধ করার কেউ নেই এবং যা তিনি রুদ্ধ করে দেন, তা আল্লাহর পরে আর কেউ খোলার নেই। তিনি পরাক্রমশালী ও জ্ঞানী।' -সূরা ফাতির : আয়াত ২।

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وبِحَمْدكَ أَشْهدُ أنْ لا إلهَ إلا أنْت أَسْتغْفِرُكَ وأتوبُ إِلَيْكَ

وآخر دعوانا أَنِ الْحَمْدُ لِلّه رَبِّ الْعالَمِين.

মহান রবের মাগফিরাত, রহমত ও সন্তুষ্টি কামনায়,

আলি মুহাম্মাদ আসসাল্লাবি

প্রথম অধ্যায় : খারেজি

প্রথম পরিচ্ছেদ

খারেজিদের উৎপত্তি ও পরিচয়

বিজ্ঞ ওলামায়ে কেরাম প্রচুর নিদর্শন ও পরিচয়ের সাথে খারেজিদের[১] সংজ্ঞা দিয়েছেন। তন্মধ্যে :

- আবুল হাসান আশআরি রাহ. বলেন, নিঃসন্দেহে যারা চতুর্থ খলিফায়ে রাশেদ আমিরুল মুমিনিন সায়্যিদুনা আলি বিন আবি তালিব রা.-এর বিরুদ্ধে খুরুজ (দলত্যাগ ও বিদ্রোহ) করেছে তাদেরকে খারেজি বলা হয়। তাঁর বিরুদ্ধে এদের বেরিয়ে যাওয়াই 'খারেজি' নামকরণের কারণ। আবুল হাসান আশআরি রাহ. লিখেন, খারেজি নামকরণের হেতু হচ্ছে—যখন হজরত আলি রা. 'তাহকিম' তথা সালিশি চুক্তিনামা মেনে নেন, তখন তারা তাঁর দলত্যাগ করে বিদ্রোহ ঘোষণা করে।[২]
- ইবনে হাজাম আন্দালুসি রাহ.-এর সংজ্ঞা অনুযায়ী খারেজি বলতে প্রত্যেক এমন সম্প্রদায়কে বুঝায়, যারা চতুর্থ খলিফা আলি রা.-এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহকারীদের মতামত কিংবা তাদের রায় গ্রহণ করেছে। তিনি লিখেন, যারা 'সালিশি ব্যবস্থা' অস্বীকার করে, গোনাহের কারণে অন্য মুসলমানকে কাফের বলে, মুসলিম শাসক ও সাধারণ লোকজনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে, কবিরা গোনাহকারীকে চিরন্তন জাহান্নামি মনে করে, অকুরাইশিদের মাঝে ইমামত বৈধ হওয়ার আকিদার ক্ষেত্রে খারেজিদের সাথে সহমত

[১] আভিধানিক অর্থে 'খারেজি' শব্দটি আরবি 'খুরুজ' (الخروج) শব্দ হতে নির্গত। যার অর্থ 'বের হওয়া বা বেরিয়ে যাওয়া'। বহুবচনে 'খাওয়ারিজ' ব্যবহৃত হয়।

[২] মাকালাতুল ইসলামিয়িন : ১/২০৭।

পোষণ করে; তারা খারেজি। যদি কেউ উপরোক্ত ছয়টি মৌলিক বিষয়ের সাথে সহমত পোষণ না করে এবং মুসলমানদের মাঝে বিদ্যমান অন্যান্য মতানৈক্যপূর্ণ মাসআলায় সে বিরোধী, তাহলে তাকে খারেজি বলা হবে না।[৩]

- আল্লামা আবুল ফাতাহ মুহাম্মাদ আবদুল করিম শাহরাস্তানি রাহ. খারেজিদের সাধারণ পরিচয় তুলে ধরতে গিয়ে এমনসব লোকদেরকে খারেজিদের অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য করেন, যারা যেকোনো কালের শরয়িভাবে স্বীকৃত মুসলমানদের ইমামের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবে। তিনি খারেজিদের সাধারণ পরিচয় তুলে ধরতে গিয়ে বলেন, জনসাধারণ কর্তৃক স্বীকৃত ও সমাদৃত হক ইমামের বিরুদ্ধে বিদ্রোহকারীরা খারেজি। চাই এই বিদ্রোহ সাহাবিগণের যুগে হেদায়াতপ্রাপ্ত খুলাফায়ে রাশেদার বিরুদ্ধে হোক বা তাঁদের পরবর্তী তাবেয়িদের যুগে কিংবা তৎপরবর্তী যেকোনো শাসকের যুগে।'[৪]

- ইবনে হাজার আসকালানি রাহ. বলেন, খারেজি ওইসব লোক; যারা তাহকিমের ঘটনার প্রেক্ষিতে হজরত আলি রা.-এর বিরুদ্ধে দলছুট হয়ে যায়। আলি রা., উসমান রা. ও তাঁদের পরিবারবর্গকে গালমন্দ করে এবং তাঁদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। তারা যদি উপরোক্ত পুতঃপবিত্র সাহাবায়ে কেরামগণকে কাফের বলে, তবে তারা চরমপন্থী গাদ্দার খারেজি।[৫]

  ইবনে হাজার রাহ. অন্যত্র তাদের পরিচয় তুলে ধরতে গিয়ে বলেন, খারেজি হলো বিদ্রোহীদের একটি দল। দলটি বেদআতি। দীনি বিধান ও মুসলমানদের সর্বোত্তম ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের কারণে তাদের খারেজি বলা হয়।[৬]

- আবুল হাসান আল মুলাত্তির অভিমত—সর্বপ্রথম স্বীকৃতিপ্রাপ্ত খারেজি হচ্ছে যারা لا حكم إلا لله 'আল্লাহ ছাড়া কোনো হুকুম নেই'

---

[৩] আল ফাসাল ফিল মিলাল ওয়াল আহওয়া ওয়ান নিহাল : ২/১১৩।
[৪] আল ফাসাল ফিল মিলাল ওয়াল আহওয়া ওয়ান নিহাল : ২/১১৩।
[৫] হাদইউস সারি ফি মুকাদ্দামাতি ফাতহিল বারি : ৪৫৯।
[৬] ফাতহুল বারি : ২/২৮৩।

বলে স্লোগান তুলেছিল। যারা বলেছিল, 'আলি রা. আবু মুসা আশআরি রা.-কে সালিশ মেনে (নাউজুবিল্লাহ) কুফরি করেছেন। অথচ সালিশের অধিকার কেবল আল্লাহরই।' এরাই খারেজি ফেরকা। তাহকিমের দিন তারা হজরত আলি রা.-এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে দলছুট হয়ে যায়। কেননা, তারা হজরত আলি রা. ও হজরত আবু মুসা আশআরি রা.-এর সালিশকৃত কাজ অপছন্দ ও ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখে বলে উঠে—لا حكم إلا لله।[৭]

- ড. নাসির আল আকল বলেন, যারা গোনাহের কারণে অন্য মুসলমানকে কাফের বলে এবং অত্যাচারী মুসলিম শাসকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে, তারা খারেজি।[৮]

সারকথা, খারেজি ওই দল; যারা সিফফিন-যুদ্ধে সালিশের সন্ধি মেনে নেওয়ার কারণে হজরত আলি রা.-এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল। এদেরকে খারেজি ছাড়া অন্যান্য নামেও সম্বোধন করা হয়। যেমন : হারুরিয়া[৯], শুরাত[১০], আল মারিকা বা মুহাক্কিমা[১১] ইত্যাদি। উল্লেখ্য, এরা 'আল মারিকা' ছাড়া অন্যান্য উপাধি নিজেদের জন্য মেনে নিয়েছে। 'আল মারিকা' মেনে না নেওয়ার কারণ হচ্ছে, হাদিস শরিফে বলা হয়েছে—

يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ

'তারা দীন থেকে এমনভাবে বেরিয়ে যাবে, যেভাবে ধনুক শিকার ভেদ করে বেরিয়ে যায়।'[১২]

কতেক ওলামায়ে কেরাম এ বিষয়ে দৃঢ় অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, খারেজিদের উৎপত্তি প্রকৃতপক্ষে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র জীবদ্দশায় ঘটেছে। এসব আলেম প্রথম খারেজি হিসেবে আখ্যায়িত

---

[৭] *আততাম্বিহ ওয়াররাদ্দু আলা আহলিল আহওয়ায়ি ওয়াল বিদয়ি* : ৪৭।

[৮] নাসির আল আকল প্রণীত *আল খাওয়ারিজ* : ২৮।

[৯] কারণ তারা সর্বপ্রথম হারুরা-নামীয় এলাকায় সমবেত হয়েছিল।

[১০] শুরাত মানে বিক্রয় হয়ে যাওয়া। ওরা নিজেদের ব্যাপারে বলে—আমরা আল্লাহর আনুগত্যের লক্ষ্যে নিজেদের প্রাণ জান্নাতের বিনিময়ে বিক্রি করে ফেলেছি।

[১১] এই নামকরণের উদ্দেশ্য হচ্ছে, তারা তাহকিকের প্রতি অস্বীকৃতি জানিয়েছে এবং لا حكم إلا لله-এর স্লোগান তুলেছে।

[১২] *মাকালাতুল ইসলামিয়িন* : ১/২০৭।

করেছেন জুলখুয়াইসারাকে। হজরত আলি বিন আবি তালিব রা. ইয়ামেনে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিয়োজিত গভর্নর ছিলেন। তিনি সেখান থেকে সামান্য স্বর্ণ পাঠিয়েছিলেন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে। জুলখুয়াইসারা নামের এই লোক রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর ওই স্বর্ণ বণ্টনের ব্যাপারে আপত্তি তুলেছিল।

আবু সাইদ খুদরি রা. হতে বর্ণিত; তিনি বলেন, আলি বিন আবি তালিব রা. ইয়ামেন থেকে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে একপ্রকার (রঙিন) চামড়ার থলে করে খুবই অল্প স্বর্ণ পাঠিয়েছিলেন। তখনও এগুলো থেকে সংযুক্ত মাটি পরিষ্কার করা হয়নি। আবু সাইদ খুদরি রা. বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চারজনের মাঝে স্বর্ণখণ্ডটি বণ্টন করে দিলেন। তারা হলেন উয়াইনা ইবনে বদর, আকরা ইবনে হাবিস, জায়দ আল খায়ল এবং চতুর্থজন আলকামা কিংবা আমির ইবনে তুফায়ল রা.।

তখন সাহাবিগণের মধ্য থেকে একজন বললেন, 'এটা পাওয়ার ব্যাপারে তাদের অপেক্ষা আমরাই অধিক হাকদার ছিলাম'। বর্ণনাকারী বলেন, কথাটি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পর্যন্ত গিয়ে পৌছল। তাই রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'তোমরা কি আমার ওপর আস্থা রাখো না? অথচ আমি আসমানের অধিবাসীদের আস্থাভাজন; সকাল-বিকাল আমার কাছে আসমানের সংবাদ আসছে।'

বর্ণনাকারী বলেন, এমন সময়ে এক ব্যক্তি উঠে দাঁড়াল। লোকটির চোখ দুটি ছিল কোটরাগত, চোয়ালের হাড় যেন বেরিয়ে পড়ছে, উঁচু কপালবিশিষ্ট, দাড়ি অতি ঘন, মাথাটি ন্যাড়া, পরনের লুঙ্গি উপরে উত্থিত। সে বলল, 'হে আল্লাহর রাসুল, আল্লাহকে ভয় করুন।' রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'তোমার জন্য আফসোস! আল্লাহকে ভয় করার ব্যাপারে দুনিয়াবাসীর মধ্যে আমি কি অধিক হাকদার নই?'

বর্ণনাকারী আবু সাইদ খুদরি রা. বলেন, লোকটি চলে গেলে খালিদ বিন ওয়ালিদ রা. বললেন, 'হে আল্লাহর রাসুল, আমি কি লোকটির গর্দান উড়িয়ে দেবো না'? রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'না, হতে পারে সে নামাজ আদায় করে'। খালিদ রা. বললেন, 'অনেক নামাজ আদায়কারী এমন আছে, যারা মুখে এমন এমন কথা উচ্চারণ করে যা তাদের অন্তরে নেই'। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন,

'আমাকে মানুষের অন্তর ছিদ্র করে, পেট ফেড়ে দেখার জন্য বলা হয়নি'। তারপর তিনি লোকটির দিকে তাকিয়ে দেখলেন। তখন লোকটি পিঠ ফিরিয়ে চলে যাচ্ছিল। তিনি বললেন, 'এই ব্যক্তির বংশ থেকে এমন এক জাতির উদ্ভব হবে, যারা শ্রুতিমধুর কণ্ঠে আল্লাহর কিতাব তেলাওয়াত করবে; অথচ আল্লাহর বাণী তাদের গলদেশের নিচে নামবে না। তারা দীন থেকে এভাবে বেরিয়ে যাবে, যেভাবে লক্ষ্যবস্তুর দেহ ভেদ করে তির বেরিয়ে যায়।' (বর্ণনাকারী বলেন) আমার মনে হয় তিনি এ কথাও বলেছেন, 'যদি আমি তাদের পাই তাহলে অবশ্যই তাদেরকে সামুদ জাতির মতো হত্যা করে দেবো।'[১৩]

উক্ত হাদিসের ব্যাখ্যায় ইমাম ইবনুল জাওজি রাহ. লিখেন, খারেজিদের সর্বপ্রথম ব্যক্তি (অর্থাৎ, খারেজি ফিতনার উদ্ভাবক) এবং সবচে নিকৃষ্ট ব্যক্তি হলো জুলখুয়াইসারা তামিমি। অন্য হাদিসে এসেছে; সে আপত্তি তুলে বলল—'হে আল্লাহর রাসুল, আপনি ইনসাফ করুন।' তখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'তোমার দুর্ভাগ্য! আমি যদি ইনসাফ না করি, তাহলে কে ইনসাফ করবে?'[১৪]

এই লোকই প্রথম খারেজি, যে ইসলামে সর্বাগ্রে বিদ্রোহের বীজ বহন করেছে। তার দুর্দশা—নিজের অভিমতকে সে ভালো ভেবেছে। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলে সে বুঝতে পারত রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রায়ের ওপর আর কোনো রায়ের ভূমিকাই থাকতে পারে না। এই লোকের সমচিন্তার লোকজনই হজরত আলি রা.-এর সাথে বিদ্রোহ করে তাঁর বিরুদ্ধে লড়াই করেছে।[১৫]

আবু মুহাম্মাদ ইবনে হাজাম[১৬] ও আল্লামা শাহরাস্তানি রাহ.[১৭] জুলখুয়াইসারাকে প্রথম খারেজি বলে আখ্যায়িত করেছেন। কতেক আলেমের অভিমত—হজরত উসমান রা.-এর বিরুদ্ধে যারা বিদ্রোহ করে

---

[১৩] বুখারি : ২/২৩২; মুসলিম : ২/৭৪২।
[১৪] সহিহ মুসলিম : ২/৭৪০।
[১৫] তালবিসে ইবলিস : ৯০।
[১৬] আল ফাসাল ফিল মিলাল ওয়াল আহওয়া ওয়ান নিহাল : ৪/১৫৭।
[১৭] আল মিলাল ওয়ান নিহাল : ১/১১৬।

তাঁকে অন্যায়ভাবে হত্যা করেছে, তাদের থেকে খারেজি ফেরকার উদ্ভব। এটাকে বলা হয় 'ফিতনায়ে উলা' বা প্রথম ফিতনা।[১৮]

এ ব্যাপারে *আকিদায়ে তাহাবিয়া* গ্রন্থের ব্যাখ্যাকার ইমাম ইবনে আবিল ইজ হানাফি বলেন, খারেজি ও শিয়া—উভয় দল প্রথম ফিতনায় অংশগ্রহণ করেছিল।'[১৯]

হাফেজ ইবনে কাসির রাহ.-ও উসমান রা.-এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও ত্রাস সৃষ্টিকারী এবং পরে তাঁকে যারা শহিদ করেছে, তাদেরকে খারেজি হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন। উসমান রা.-কে অন্যায়ভাবে হত্যার আলোচনাকালে তিনি লিখেন, 'খারেজিরা এলো। তারা রাষ্ট্রীয় কোষাগারের সম্পদ লুণ্ঠন করল। সেখানে প্রচুর জিনিসপাতি ছিল।'[২০]

অগ্রাধিকারযোগ্য অভিমত

উপরোক্ত বিবরণ সামনে রেখে খারেজিদের ব্যাপারে যে উক্তিটি অগ্রাধিকারযোগ্য মনে হয় তা হলো, জুলখুয়াইসারা থেকে নিয়ে উসমান রা.-এর বিরুদ্ধে ত্রাস সৃষ্টিকারী এবং তাহকিমের ঘটনার পর হজরত আলি রা.-এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণাকারী খারেজিদের মাঝে যদিও পারস্পরিক বেশ দৃঢ় সংযোগ বিদ্যমান; কিন্তু অকাট্য অর্থে খারেজি পরিভাষা কেবল ওইসব লোকদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যারা তাহকিমের ঘটনার কারণে দলছুট হয়ে গিয়েছিল। তারা একটি দলের আঙ্গিকে প্ররোচনা যোগায়। তাদের ছিল স্বতন্ত্র চিন্তাধারা এবং বিশেষ রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি—যা যথারীতি একটি আকিদা হিসেবে আজ পর্যন্ত পৃথিবীর দিকে দিকে মনস্তাত্ত্বিক প্রভাব ছড়িয়ে রেখেছে।[২১]

---

[১৮] *আকিদাতু আহলিস সুন্নাহ ফিস সাহাবাহ* : ৩/১১৪১।

[১৯] *শারহুল আকিদাতিত তাহাবিয়া* : ৫৬৩।

[২০] *আলবিদায়া ওয়াননিহায়া* : ৭/২০২।

[২১] আল আওয়াজি প্রণীত *ফিরাকুন মুআসারাহ* : ১/৬৭; আবদুল হামিদ প্রণীত *খেলাফতে আলি* : ২৯৭।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

খারেজিদের নিন্দায় বর্ণিত সহিহ হাদিসসমূহ

দলছুট অভিশপ্ত খারেজিদের নিন্দায় রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বহু হাদিস বর্ণিত রয়েছে। ওইসব হাদিসে তাদের এমনসব গর্হিত ও হীন নিদর্শনসমূহ বিবৃত আছে, যা দ্বারা তারা অত্যন্ত নিম্নস্তরের খবিস হিসেবে আখ্যায়িত। তাদের অনিষ্টতার প্রতি ইঙ্গিতবাহী কিছু হাদিস উল্লেখ করা হলো :

আবু সাইদ খুদরি রা. থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন, একবার আমরা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে উপস্থিত ছিলাম এবং তিনি কিছু জিনিস বণ্টন করছিলেন। এমন সময় বনু তামিম গোত্রের জুলখুয়াইসারা নামক এক ব্যক্তি এসে বলল, 'হে আল্লাহর রাসুল, ইনসাফ করুন।' তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'হতভাগা! তোমার জন্য আফসোস! আমি যদি ইনসাফ না করি, তাহলে কে ইনসাফ করবে? আমি যদি ইনসাফ না করি তাহলে তুমি তো ক্ষতিগ্রস্ত ও নিষ্ফল হয়ে যাবে।'

অতঃপর উমর ইবনুল খাত্তাব রা. বললেন, 'হে আল্লাহর রাসুল, আমাকে তার শিরশ্ছেদ করার অনুমতি দিন'। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন,

دَعْهُ فَإِنَّ لَهُ أَصْحَابًا يَحْقِرُ أَحَدُكُمْ صَلَاتَهُ مَعَ صَلَاتِهِمْ، وَصِيَامَهُ مَعَ صِيَامِهِمْ، يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنْ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنْ الرَّمِيَّةِ يُنْظَرُ إِلَى نَصْلِهِ فَلَا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ، ثُمَّ يُنْظَرُ إِلَى رِصَافِهِ فَمَا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ، ثُمَّ يُنْظَرُ إِلَى نَضِيِّهِ - وَهُوَ قِدْحُهُ - فَلَا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ، ثُمَّ يُنْظَرُ إِلَى قُذَذِهِ فَلَا يُوجَدُ فِيهِ

شَيْءٌ، قَدْ سَبَقَ الْفَرْثَ وَالدَّمَ، آيَتُهُمْ رَجُلٌ أَسْوَدُ إِحْدَى عَضُدَيْهِ مِثْلُ ثَدْيِ الْمَرْأَةِ أَوْ مِثْلُ الْبَضْعَةِ تَدَرْدَرُ، وَيَخْرُجُونَ عَلَى حِينِ فُرْقَةٍ مِنَ النَّاسِ

'তাকে ছেড়ে দাও। কেননা, তার এমন কিছু সঙ্গী-সাথি রয়েছে, যাদের নামাজ-রোজার তুলনায় তোমাদের নামাজ-রোজা নিম্নমানের বলে মনে হয়। তারা কুরআন পাঠ করবে; অথচ তা তাদের কণ্ঠনালি অতিক্রম করবে না। তির যেভাবে শিকার ভেদ করে বেরিয়ে যায়, তারাও সেভাবে ইসলাম থেকে বেরিয়ে যাবে। অতঃপর সে (ধনুকধারী) তিরের ফলার মূলভাগ পরীক্ষা করে দেখে; এতেও সে কিছুই দেখতে পায় না। তারপর সে তির পরীক্ষা করে দেখে; এতেও সে দেখে না। অবশেষে সে তিরের পালক পরীক্ষা করে দেখে; এতেও সে কিছু পায় না। তির এত দ্রুতগতিতে বেরিয়ে যায় যে, রক্ত বা মলের দাগ এতে লাগতে পারে না। এ সম্প্রদায়কে চেনার উপায় হলো—এদের মধ্যে এমন এক ব্যক্তির আবির্ভাব হবে, যার এক বাহুতে মহিলাদের স্তনের ন্যায় একটি অতিরিক্ত মাংসপেশী থাকবে এবং তা থলথল করতে থাকবে। মানুষের মধ্যে বিরোধকালে এদের আবির্ভাব ঘটবে।'

আবু সাইদ রা. বলেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি—একথা আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে শুনেছি এবং আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি—আলি বিন আবি তালিব রা. তাদের সাথে যখন যুদ্ধ করেছিলেন; আমি স্বয়ং তাঁর সাথে ছিলাম। অতঃপর তিনি উল্লেখিত ব্যক্তিকে খুঁজে বের করে আনার জন্য নির্দেশ দিলেন। তাকে খুঁজে আলি রা.-এর সামনে উপস্থিত করা হলো। আমি তাকে প্রত্যক্ষ করলাম—তার মধ্যে সব চিহ্ন ও বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান রয়েছে; যা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার সম্বন্ধে বলেছেন।[২২]

ইমাম বুখারি ও ইমাম মুসলিম রাহ. বর্ণনা করেন, আবু সালামাহ ও আতা ইবনে ইয়াসার রা. থেকে বর্ণিত; তাঁরা উভয়ে আবু সাইদ খুদরি রা.-এর

[২২] *মুসলিম* : ২/৭৪৩-৭৪৪।

কাছে এসে জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি কি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হারুরিয়া (খারেজি জাতি) সম্পর্কে কোনো মন্তব্য করতে শুনেছেন?' তিনি বলেন, 'হারুরিয়া কে—তা আমি জানি না। তবে আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি—

يَخْرُجُ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ - وَلَمْ يَقُلْ: مِنْهَا - قَوْمٌ تَحْقِرُونَ صَلَاتَكُمْ مَعَ صَلَاتِهِمْ، فَيَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ، لَا يُجَاوِزُ حُلُوقَهُمْ - أَوْ حَنَاجِرَهُمْ - يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ مُرُوقَ السَّهْمِ مِنَ الرَّمِيَّةِ، فَيَنْظُرُ الرَّامِي إِلَى سَهْمِهِ إِلَى نَصْلِهِ إِلَى رِصَافِهِ، فَيَتَمَارَى فِي الْفُوقَةِ، هَلْ عَلِقَ بِهَا مِنَ الدَّمِ شَيْءٌ

"এ উম্মতের মধ্যে এমন এক সম্প্রদায়ের আবির্ভাব হবে (কিন্তু তিনি তখনকার উম্মতকে নির্দিষ্ট করে বলেননি) যাদের নামাজের তুলনায় তোমরা নিজেদের নামাজকে নিম্নমানের মনে করবে। তারা কুরআন পাঠ করবে; অথচ এ পাঠ তাদের কণ্ঠনালি অতিক্রম করবে না। তারা দীন থেকে এমনভাবে বেরিয়ে যাবে, তির ছুড়লে যেভাবে বেরিয়ে যায়। অতঃপর শিকারি তার ধনুক, তিরের ফলা এবং এর পালকের দিকে লক্ষ করে। সে এর লক্ষ্যবস্তুর দিকে দৃষ্টি প্রসারিত করে চিন্তা করে তিরের কোনো অংশ রক্তে রঞ্জিত হয়েছে কি না। (অর্থাৎ, তাদের মধ্যে ইসলামের নামগন্ধ এবং সামান্যতম চিহ্নও থাকবে না)।"''[২৩]

সহিহ বুখারিতে ইউসাইর ইবনে আমর রাহ. হতে বর্ণিত; তিনি বলেন, আমি সাহল ইবনে হুনাইফ রা.-কে জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে খারেজিদের সম্পর্কে কিছু বলতে শুনেছেন কি?' তিনি বললেন, 'আমি তাঁকে বলতে শুনেছি, আর তখন তিনি তাঁর হাত ইরাকের দিকে বাড়িয়েছিলেন—

يَخْرُجُ مِنْهُ قَوْمٌ يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ، لاَ يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الإِسْلاَمِ مُرُوقَ السَّهْمِ مِنَ الرَّمِيَّةِ

[২৩] মুসলিম : ২/৭৪৩-৭৪৪।

"সেখান থেকে এমন একটি সম্প্রদায় বের হবে, যারা কুরআন পড়বে সত্য; কিন্তু তা তাদের গলা অতিক্রম করবে না। তারা ইসলাম থেকে বেরিয়ে যাবে; যেমন তির শিকার ভেদ করে বেরিয়ে যায়।"'[২৪]

উপরোক্ত হাদিসগুলোতে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী لا يُجَاوِزُ تراقِيَهُمْ এর মধ্যে দুটি বিষয়ের সম্ভাবনা রয়েছে। যথা :

১. কুরআন তাদের কণ্ঠনালির নিচে যাবে না। অর্থাৎ, তারা এর দ্বারা কোনো শিক্ষা অর্জন করবে না। বুঝেশুনে পড়বে না। সেটাকে তারা কুরআনের উদ্দেশ্য ছাড়া অন্য অর্থে ব্যবহার করবে।

২. কুরআন তাদের কণ্ঠনালির নিচে যাবে না। অর্থাৎ, তাদের তেলাওয়াত আল্লাহ তাআলা পর্যন্ত পৌঁছবে না। তারা এর কোনো সওয়াব পাবে না।[২৫]

নববি বাণী অনুযায়ী তাদের নিন্দনীয় কর্মকাণ্ডের মধ্যে এটাও রয়েছে যে, তাদের ইমানের দাবি হবে কেবল মৌখিক। তারা হবে দুর্বল বোধ-বুদ্ধির অধিকারী। কুরআন পড়ে তারা নিজেদের দুর্বল মস্তিষ্কের কারণে তাদের মতাদর্শ-বিরোধী আয়াতগুলোকে নিজেদের পক্ষে মনে করবে।

ইমাম বুখারি রাহ. হজরত আলি রা.-এর হাদিস উদ্ধৃত করেছেন। আলি রা. বলেছেন, 'আমি যখন তোমাদের নিকট রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কোনো হাদিস বর্ণনা করি, তখন আমার এমন অবস্থা হয় যে, তাঁর ওপর মিথ্যারোপ করার চেয়ে আকাশ হতে পড়ে ধ্বংস হয়ে যাওয়া আমার নিকট বেশি পছন্দনীয়। আমরা নিজেরা যখন আলোচনা করি তখন কথা হলো এই যে, যুদ্ধ ছল-চাতুরি মাত্র। আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি—

سَيَخْرُجُ قَوْمٌ فِي آخِرِ الزَّمَانِ، أَحْدَاثُ الأَسْنَانِ، سُفَهَاءُ الأَحْلاَمِ، يَقُولُونَ مِنْ خَيْرِ قَوْلِ البَرِيَّةِ، لاَ يُجَاوِزُ إِيمَانُهُمْ حَنَاجِرَهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ

---

[২৪] *সহিহ বুখারি* : হাদিস নং ৬৯৩৪।

[২৫] *ফাতহুল বারি* : ৬/৬১৮।

"শেষ যুগে একদল যুবকের আবির্ভাব ঘটবে; যারা হবে স্বল্প বুদ্ধিসম্পন্ন। তারা মুখে খুব ভালো কথা বলবে। তারা ইসলাম হতে বেরিয়ে যাবে; যেভাবে তির ধনুক হতে বেরিয়ে যায়। তাদের ইমান গলদেশ পেরিয়ে ভেতরে প্রবেশ করবে না।"'[২৬]

উপরের দুটি হাদিসে খারেজিদের নিন্দা করা হয়েছে। বলা হয়েছে—তাদের ইমান কেবল তাদের মুখ পর্যন্তই। গণ্ডদেশের নিচে অবতরণ করে না। এটা যে কত মারাত্মক দোষ, তা সহজেই অনুমেয়।[২৭]

খারেজিদের নিকৃষ্ট নিদর্শনের মধ্যে এটাও আছে—তারা দীন থেকে বেরিয়ে যাবার পর পুনরায় দীনে প্রবেশের সুযোগ পাবে না। গোটা সৃষ্টিজগতে তারাই সবচে নিকৃষ্ট। *সহিহ মুসলিম*-এ হজরত আবু জর রা. থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

إِنَّ بَعْدِي مِنْ أُمَّتِي - أَوْ سَيَكُونُ بَعْدِي مِنْ أُمَّتِي - قَوْمٌ يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لاَ يُجَاوِزُ حَلاَقِيمَهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَخْرُجُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ ثُمَّ لاَ يَعُودُونَ فِيهِ هُمْ شَرُّ الْخَلْقِ وَالْخَلِيقَةِ

'আমার পরে আমার উম্মতের মধ্যে বা অচিরেই আমার উম্মতের মধ্যে এমন এক সম্প্রদায়ের আবির্ভাব হবে, তারা কুরআন পাঠ করবে; কিন্তু তা তাদের কণ্ঠনালি অতিক্রম করবে না। তির যেভাবে শিকার ভেদ করে চলে যায়, তারাও তেমনিভাবে দীন থেকে বেরিয়ে যাবে; আর ফিরে আসবে না। সৃষ্টিকুলের মধ্যে তারা নিকৃষ্ট ও অধম।'[২৮]

হজরত আবু সাইদ খুদরি রা.-এর হাদিসে এসেছে—রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর উম্মতের পরবর্তী একটি প্রজন্মের আলোচনা করলেন। লোকদের মাঝে যখন কলহ ও বিবাদের সৃষ্টি হবে তখন একদল লোক বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। তাদের পরিচয় হচ্ছে, তাদের মাথা মুণ্ডানো

---

[২৬] বুখারি : ২/২৮১।
[২৭] আকিদাতু আহলিস সুন্নাহ : ৩/১১৮৩।
[২৮] মুসলিম : ২/৭৫০।

থাকবে। সৃষ্টিকুলের মধ্যে তারা নিকৃষ্ট ও অধম। দুই দলের মধ্যে যে দলটি হকের অধিক নিকটতর হবে সেটিই তাদেরকে হত্যা করবে।[29]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খারেজিদেরকে জগতের সবচে নিকৃষ্ট বলে আখ্যায়িত করেছেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুক্ত গোলাম উবায়দুল্লাহ ইবনে আবু রাফি রা. থেকে বর্ণিত; যখন হারুরিয়া বের হলো এবং যখন সে আলি রা.-এর সাথে ছিল তখন বলল, لا حكم إلا لله 'আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও হুকুম দেওয়ার অধিকার নেই।' আলি রা. বলেন, كلمة حق أريد بها باطل 'কথাটি সত্য; কিন্তু এর পেছনে তাদের হীন উদ্দেশ্য নিহিত রয়েছে।'

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমন লোকদের সম্পর্কে যে বর্ণনা দিয়েছিলেন, আমি তাদের মধ্যে সে চিহ্নগুলো ভালোভাবেই লক্ষ করছি। তারা মুখে সত্য কথা বলে; কিন্তু তা তাদের 'এটা' থেকে অতিক্রম করে না। এ বলে তিনি (উবায়দুল্লাহ) তাঁর কণ্ঠনালির দিকে ইঙ্গিত করলেন। (অর্থাৎ, সত্য কথা গলার নিচে যায় না)। আল্লাহর সৃষ্টিজগতে এরা তাঁর চরম শত্রু। তাদের মধ্যে কালো বর্ণের এক ব্যক্তি রয়েছে, যার একটি হাত বকরির স্তন বা স্তনের বোটার ন্যায়।

অতঃপর আলি রা. তাদেরকে হত্যা করার পর বললেন, 'তোমরা তাকে খুঁজে বের করো'। কিন্তু তাঁরা তাকে খুঁজে পেল না। তিনি পুনরায় বললেন, 'তোমরা গিয়ে আবার খোঁজ করো। আল্লাহর শপথ, আমি মিথ্যা বলিনি এবং আমার কাছেও মিথ্যা বলা হয়নি'। (অর্থাৎ, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার কাছে মিথ্যা বলেননি এবং আমিও তোমাদের কাছে মিথ্যা বলছি না)।

এ কথাটি তিনি দুই অথবা তিনবার বললেন। তাঁরা তাকে ধ্বংসস্তূপের মধ্যে পেয়ে গেল এবং নিয়ে এসে তাঁর সামনে রাখল। উবায়দুল্লাহ রা. বলেন, তাদের এ তৎপরতার সময় এবং আলি রা. খারেজিদের সম্বন্ধে এ উক্তিটি করার সময় আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম।[30]

খারেজিদের দুর্ভাগ্য এবং তাদের সম্পর্কে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিন্দার একটা দিক হচ্ছে—তারা সত্যের পরিচয় এবং তার

---

[29] *মুসলিম* : হাদিস নং ১০৬৫।

[30] *মুসলিম* : ২/৭৪৯।

অনুসরণ থেকে বঞ্চিত থাকবে। হজরত সাহল ইবনে হুনাইফ রা. থেকে বর্ণিত; রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

يَتِيهُ قَوْمٌ قِبَلَ الْمَشْرِقِ مُحَلَّقَةٌ رُءُوسُهُمْ

'মাথা ন্যাড়া এক সম্প্রদায় (খারেজি) পূর্ব দিক থেকে বেরোবে।'

ইমাম নববি রাহ. বলেন, يَتِيهُ قومٌ দ্বারা বোঝা যাচ্ছে এই সম্প্রদায় সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে যাবে। কেননা, يَتِيهُ এর 'অতীতবাচক ক্রিয়া' হচ্ছে تاه; যার অর্থ 'সঠিক পথ হতে বিচ্যুত হওয়া'।[৩১]

তাদের আরেকটি নিকৃষ্ট নিদর্শন হচ্ছে—মুসলমানদের হত্যা করা, খ্রিষ্টান ও পৌত্তলিকদের ছেড়ে দেওয়াকে তারা নিজেদের ধর্ম মনে করে। *সহিহ মুসলিম*-এ হজরত আবু সাইদ খুদরি রা. হতে বর্ণিত দীর্ঘ একটি হাদিসের একপর্যায়ে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

إِنَّ مِنْ ضِئْضِئِ هَذَا، أَوْ: فِي عَقِبِ هَذَا قَوْمًا يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لاَ يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ مُرُوقَ السَّهْمِ مِنَ الرَّمِيَّةِ، يَقْتُلُونَ أَهْلَ الإِسْلاَمِ وَيَدَعُونَ أَهْلَ الأَوْثَانِ، لَئِنْ أَنَا أَدْرَكْتُهُمْ لَأَقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ عَادٍ

'এ ব্যক্তির বংশ হতে বা এ ব্যক্তির পরে এমন কিছুসংখ্যক লোক হবে, তারা কুরআন পড়বে; কিন্তু তা তাদের কণ্ঠনালি অতিক্রম করবে না। দীন হতে তারা এমনভাবে বেরিয়ে পড়বে যেমনি ধনুক হতে তির বেরিয়ে যায়। তারা ইসলামের অনুসারীদেরকে (মুসলিমদেরকে) হত্যা করবে আর মূর্তিপূজারীদেরকে হত্যা করা হতে বাদ দেবে। আমি যদি তাদের পেতাম তাহলে তাদেরকে আদ জাতির মতো অবশ্যই হত্যা করতাম।'

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এই ভবিষ্যদ্বাণী ছিল তাঁর একটি মুজেজা। ঘটনা হুবহু এমনটিই ঘটেছে। মুসলমানদের বিরুদ্ধে তারা

---

[৩১] *শারহুন নববি আলা সহিহ মুসলিম* : ৭/১৭৫।

তরবারি উন্মুক্ত রাখলেও ইহুদি ও কাফেরদের বেলায় সেটা কোষবদ্ধ রেখেছে।[৩২]

খারেজিদের নিকৃষ্ট নিদর্শন; যা দ্বারা তাদের উলঙ্গ অনাচার প্রতিভাত হয়, তা হচ্ছে—তাদের আবির্ভাবকালে তাদেরকে হত্যা করার জন্য রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উৎসাহ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, 'আমি নিজে যদি তাদের পেতাম, তাহলে আদ ও সামুদ জাতির মতো হত্যা করে তাদের নাম-নিশানা মিটিয়ে দিতাম।' তিনি আরও বলেছেন, 'যারা তাদের হত্যা করবে, কেয়ামতের দিন তাঁরা আল্লাহর কাছে তার প্রতিদান পাবে।'

এরই প্রেক্ষিতে হজরত আলি রা. তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার এবং তাদের ধ্বংস করার সৌভাগ্য লাভ করেন। কেননা, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাতানো নিদর্শনমতে তাদের আবির্ভাব হয়েছে হজরত আলি রা.-এর যুগে। তিনি সিরিয়া অভিযানের লক্ষ্যে যে বাহিনী প্রস্তুত করেছিলেন—তাদের নিয়ে খারেজিদের উদ্দেশে বেরিয়ে পড়েন। নাহরাওয়ানে লড়াই করেন তাদের বিরুদ্ধে। সেখানে মাত্র ১০ জনের কম খারেজি বাঁচতে সক্ষম হয়। নিজের পক্ষ থেকে তিনি সেই যুদ্ধের সূচনা করেননি; বরং যখন তারা অন্যায়ভাবে রক্তের হোলিখেলায় মেতে উঠতে লাগল, মুসলমানদের সম্পদ লুণ্ঠন করতে আরম্ভ করল, কথা-কাজে অনাচার শুরু করে দিলো; তখনই তিনি তাদের নির্মূলে চূড়ান্ত লড়াই আরম্ভ করেন।

তাদের নিন্দায় শুধু এটুকু বর্ণনাই যথেষ্ট। নতুবা তাদের ব্যাপারে এত অধিক বর্ণনা রয়েছে যে, কোনো হাদিসগ্রন্থই সেই আলোচনা হতে খালি নেই।[৩৩]

পরবর্তী পৃষ্ঠাগুলোতে ইনশাআল্লাহ তাদের আরও কিছু পরিচয় ও চিন্তাধারা পর্যায়ক্রমে আলোচনা করা হবে। যেমন : হারুরার দিকে খারেজিদের পলায়ন, তাদের সাথে ইবনে আব্বাস রা.-এর মুনাজারা-বিতর্ক, তাদেরকে সঠিক পথে আনার লক্ষ্যে হজরত আলি রা.-এর প্রচেষ্টা, নাহরাওয়ান অভিযানের কারণ, নাহরাওয়ান যুদ্ধের ফলাফল, কিছু মূলনীতিগত আলোচনা ও পর্যালোচনা। খারেজি চিন্তা-চেতনা লালনকারী মানুষ এ যুগেও আছে কি? তাদের অস্তিত্বের হেতু ও আন্দোলন কী? তাদের সাথে কীরূপ আচরণ করা হবে—ইত্যাদি ইত্যাদি।

---

[৩২] আকিদাতু আহলিস সুন্নাতি ওয়াল জামাআতি ফিস সাহাবাতিল কিরাম : ৩/১১৮৫।
[৩৩] আকিদাতু আহলিস সুন্নাতি ওয়াল জামাআতি ফিস সাহাবাতিল কিরাম : ৩/১১৮।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

খারেজিদের পলায়ন এবং ইবনে আব্বাস রা.-এর মুনাজারা-বিতর্ক

হজরত আলি যখন তাঁর বাহিনীর সাথে সিফফিন হতে কুফা ফিরে যাচ্ছিলেন, ঠিক তখনই খারেজিরা আলি রা.-এর বাহিনীর বহু লোক নিয়ে তাঁর থেকে পৃথক হয়ে যায়। তাদের সংখ্যা কতেক বর্ণনামতে ১০ হাজারের কিছু বেশি। কিছু কিছু বর্ণনা তাদের সংখ্যা ১২ হাজার বলে উল্লেখ করেছে।[৩৪] আরেক বর্ণনামতে তাদের সংখ্যা ছিল ৮ হাজার।[৩৫] কেউ কেউ ১৪ হাজার বলেও মত পোষণ করেছেন।[৩৬] তদ্রূপ কোনো কোনো বর্ণনায় এই সংখ্যা ২০ হাজারও বলা হয়েছে। তবে এই বর্ণনাটি সনদবিহীন।[৩৭]

যাইহোক, এসব লোক কুফা পৌছার পূর্বে আলি রা.-এর বাহিনী থেকে কয়েক স্থানে পৃথক হয়। বাহিনী থেকে এই লোকদের চলে যাওয়া হজরত আলি রা.-এর জন্য বেশ দুশ্চিন্তা ও উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তবুও তিনি তাঁর অনুগত অবশিষ্ট বাহিনী নিয়ে চললেন এবং কুফা পৌছে গেলেন। সেখানে পৌছার পর তিনি সংবাদ পেলেন—খারেজিরা একটি সংগঠিত দল গঠন করেছে। তারা নামাজের জন্য একজন আমির এবং যুদ্ধের জন্য আরেকজন আমির নির্ধারণ করেছে। তারা শিষ্টের লালন ও দুষ্টের দমনের দাবি করছে এবং আল্লাহর জন্য বায়আত করছে। এই সংবাদ পেয়ে আলি রা. আরও বেশি উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লেন। কেননা, এটা মুসলিম জামাত থেকে পৃথক হয়ে যাবার লক্ষণ। তারা যত অন্যায়ই করুক—আলি রা. মনেপ্রাণে চেয়েছিলেন এরা যেন মুসলিম বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। এই লক্ষ্যে তিনি

---

[৩৪] *তারিখে বাগদাদ* : ১/১৬০।
[৩৫] *আলবিদায়া ওয়ান নিহায়া* : ৭/২৮০, ২৮১ [সনদ বিশুদ্ধ]; *মাজমাউজ জাওয়ায়িদ* : ৬/২৩৫।
[৩৬] *মুসান্নাফে আবদির রাজ্জাক* : ১০/১৫৭, ১৬০ [সনদ হাসান]।
[৩৭] *তারিখে খলিফা* : ১৯২।

খারেজিদের সঙ্গে মুনাজারা বা বিতর্ক করার জন্য হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা.-কে তাদের কাছে পাঠান।

আসুন, স্বয়ং ইবনে আব্বাস রা.-এর মুখে বিস্তারিত শুনি। তিনি বলেন, আমি তাদের কাছে চললাম। ইয়ামেনের তৈরি একটি সুন্দর জামা পরিধান করলাম। মাথা আঁচড়ালাম। ঠিক দুপুরের সময় তাদের কাছে পৌঁছলাম। তখন তারা একটি ঘরে সমবেত। উল্লেখ্য, ইবনে আব্বাস রা. ছিলেন একজন সুদর্শন উচ্চকণ্ঠী ব্যক্তি। তিনি বলেন, তারা আমাকে দেখে সাদর সম্ভাষণ জানিয়ে বলল, 'হে ইবনে আব্বাস, এই জামাটি কেমন?' আমি বললাম, 'এই জামার কারণে আমাকে দোষী ভেব না। আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে উত্তম হতে উত্তম জামা পরিধান করতে দেখেছি। কুরআনে এ ব্যাপারে বলা হয়েছে—

﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ الَّذِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾

"আপনি বলুন, আল্লাহর সাজ-সজ্জা, যা তিনি বান্দাদের জন্যে সৃষ্টি করেছেন এবং পবিত্র খাদ্রবস্তুসমূহকে কে হারাম করেছে? আপনি বলুন, এসব নেয়ামত আসলে পার্থিব জীবনে মুমিনদের জন্যে এবং কেয়ামতের দিন খাঁটিভাবে তাদেরই জন্য। এমনিভাবে আমি আয়াতসমূহ বিস্তারিত বর্ণনা করি তাদের জন্য; যারা বুঝে।"' *-সুরা আরাফ : আয়াত ৩২।*

তারা বলল, 'ইবনে আব্বাস, আপনি কেন এসেছেন?' আমি বললাম, 'রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চাচাতো ভাই, তাঁর জামাতা এবং তাঁর ওপর প্রথম পর্যায়ে ইমান পোষণকারী; অর্থাৎ, আলির প্রতি এমন চরম মনোভাব পোষণ করছেন কেন? অথচ তাঁদের সামনে কুরআন অবতীর্ণ হতো। আপনাদের চেয়ে তাঁরা কুরআনের অর্থ ও মর্ম ভালো বুঝেন। আপনাদের মাঝে তো এমন ব্যক্তি নেই। আমি আপনাদের ও তাঁর চিন্তাধারার সাথে পরিচিত হতে এসেছি।' একথা শুনে কিছু লোক পৃথক হয়ে আমার কাছে এলো। আমি বললাম, 'রাসুলের সাহাবা এবং আলি রা.-এর সাথে আপনাদের বিরুদ্ধবাদী আচরণের হেতু কী?' তারা বলল, 'আমরা তার

তিনটি কাজের বদলা নিতে চাই।' আমি বললাম, 'সে তিনটি কাজ কী কী?' তারা বলল :

১. 'সিফফিনের যুদ্ধক্ষেত্রে আবু মুসা আশআরি ও আমর ইবনুল আসকে সালিশ নিযুক্ত করে তিনি আল্লাহর দীনের ব্যাপারে মানুষকে বিচারক নিযুক্ত করেছেন।

২. আয়েশা ও মুআবিয়ার সাথে তিনি যুদ্ধ করেছেন; কিন্তু তাদের ধন-সম্পদ গনিমত হিসেবে এবং যুদ্ধবন্দিদেরকে দাস-দাসী হিসেবে গ্রহণ করেননি।

৩. মুসলমানরা তার হাতে বায়আত গ্রহণ করে তাকে আমির হিসেবে মেনে নেওয়া সত্ত্বেও তিনি "আমিরুল মুমিনিন" উপাধি পরিহার করেছেন।'

জবাবে ইবনে আব্বাস বললেন, 'যদি আমি আল্লাহর কিতাব ও রাসুলের হাদিস থেকে এমন কিছু কথা আপনাদের সামনে পেশ করতে পারি; যা আপনারা অস্বীকার করতে পারেন না, তাহলে আপনারা যে বিশ্বাসের ওপর আছেন তা থেকে প্রত্যাবর্তন করবেন কি?'

তারা সম্মতিসূচক জবাব দিলে আমি বললাম, 'আপনাদের অভিযোগ; তিনি দীনের ব্যাপারে মানুষকে বিচারক নিযুক্ত করে অপরাধ করেছেন। অথচ আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ﴾

"হে ইমানদারগণ, তোমরা ইহরাম অবস্থায় শিকার করো না। তোমাদের মধ্যে কেউ যদি স্বেচ্ছায় কোনো কিছু শিকার করে, তাহলে তোমাদের অন্তর্গত দুইজন সুবিচারক সে সম্পর্কে যে আদেশ করে, সে অনুযায়ী অনুরূপ একটি পশু বিনিময় হিসেবে কাবায় উপস্থিত করবে।" *-সুরা মায়েদা : আয়াত ৯৫।*

আল্লাহর নামে আমি শপথ করে বলছি, চার দিরহাম মূল্যের একটি নিহত খরগোশের ব্যাপারে বিচারক নিয়োগ করা থেকে মানুষের রক্ত ও জীবন রক্ষা

এবং তাদের পারস্পরিক ঝগড়া-বিবাদ মীমাংসার উদ্দেশ্যে মানুষকে বিচারক নিয়োগ করা অধিক যুক্তিসংগত নয় কি?

আরও শোনো, স্ত্রী ও তার স্বামীর ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

﴿وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا﴾

"যদি তাদের মধ্যে সম্পর্কচ্ছেদ হওয়ার মতো পরিস্থিতিরই আশঙ্কা করো, তবে স্বামীর পরিবার থেকে একজন এবং স্ত্রীর পরিবার থেকে একজন সালিশ নিযুক্ত করবে। তারা উভয়ের মীমাংসা চাইলে আল্লাহ তাদের মধ্যে মীমাংসা ও মিলমিশের পরিবেশ সৃষ্টি করে দেবেন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সবকিছু সম্পর্কে অবহিত।" *-সুরা নিসা আয়াত ৩৫।*

আপনাদেরকে আল্লাহর নামে আমি শপথ করে বলছি, মুসলমানদের মাঝে সমঝোতা এবং পারস্পরিক রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ রোধে বিচারক নির্ধারণ করা উত্তম নাকি মহিলার লজ্জাস্থানের ক্ষেত্রে বিচারক নির্ধারণ করা উত্তম?'

তারা বলল, 'হ্যাঁ, মানুষের রক্তের নিরাপত্তা ও তাদের পারস্পরিক বিবাদ নিষ্পত্তির জন্য বিচারক নিয়োগ অধিক সংগত।' ইবনে আব্বাস বললেন, 'আমরা তাহলে এ ব্যাপারে সিদ্ধান্তে উপনীত হলাম?' তারা বলল, 'হ্যাঁ।'

ইবনে আব্বাস রা. বললেন, 'আপনারা বলছেন আলি যুদ্ধ করেছেন আয়েশা ও মুআবিয়ার বিরুদ্ধে; কিন্তু তাদের বন্দি করে দাস-দাসী বানাননি। আপনারা কি চান আপনাদের মা আয়েশাকে দাসী বানানো হোক এবং অন্যান্য দাসীদের সাথে যেমন আচরণ করা হয় তাঁর সাথেও তেমন করা হোক? উত্তরে যদি "হ্যাঁ" বলেন, তাহলে আপনারা কাফের হয়ে যাবেন। (কারণ, শরিয়তে দাসীর সাথে স্ত্রীর ন্যায় আচরণ বৈধ।)

আর যদি বলেন, আয়েশা আমাদের "মা" নন, তাহলেও আপনারা কাফের হবেন। কারণ, আল্লাহ বলছেন,

﴿النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ﴾

"নবি মুমিনদের ওপর তাদের নিজেদের অপেক্ষা অধিকতর স্নেহশীল এবং তার সহধর্মিনীগণ তাদের জননী।" *-সূরা আহজাব : আয়াত ৩৬।*

এখন এ দুটি জবাবের যেকোনো একটি আপনারা বেছে নিন।'

তারপর আমি বললাম, 'আমরা তাহলে এ ব্যাপারেও সিদ্ধান্তে উপনীত হলাম'? তারা বলল, 'হ্যাঁ'।

সবশেষে আমি বললাম, 'আলি "আমিরুল মুমিনিন" উপাধিটি পরিহার করেছেন—আপনারা এ অভিযোগ তুলেছেন। অথচ হুদাইবিয়ার সন্ধির সময়ে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও মক্কার মুশরিকদের মধ্যে যে চুক্তিটি সম্পাদিত হয়, তাতে "মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ" বাক্যটি লেখা হলে কুরাইশরা বলেছিল—আমরা যদি বিশ্বাসই করতাম আপনি আল্লাহর রাসুল, তাহলে আমরা আপনার কাবা শরিফে পৌঁছার পথে প্রতিবন্ধক হতাম না বা আপনার সাথে সংঘর্ষেও লিপ্ত হতাম না। আপনি বরং এ বাক্যটির পরিবর্তে "মুহাম্মাদ ইবনু আবদিল্লাহ" কথাটি লিখুন। সেদিন কিন্তু রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ কথা বলতে বলতে তাদের দাবি মেনে নিয়েছিলেন—"আল্লাহর কসম! আমি সুনিশ্চিতভাবে বলছি আমি আল্লাহর রাসুল; তা তোমরা আমাকে যতই অস্বীকার করো না কেন।" আলি ঠিক একই কারণে "আমিরুল মুমিনিন" উপাধিটি পরিহার করেছেন। কারণ, মুআবিয়া যদি তাঁকে "আমিরুল মুমিনিন"' বলে স্বীকারই করে নিতেন, তাহলে তো কোনো বিরোধই থাকত না।'

এ কথার পর আমি বললাম, 'তাহলে আমরা এ ব্যাপারেও সিদ্ধান্তে উপনীত হলাম?' তারা বলল, 'হ্যাঁ'।

হজরত আলির পক্ষত্যাগীদের সাথে আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের এ জ্ঞানগর্ভ আলোচনায় তারা তৃপ্ত হলো এবং তাঁর বলিষ্ঠ যুক্তিকে তারা অকুণ্ঠচিত্তে মেনে নিল। এ সাক্ষাৎকারের পর ২ হাজার লোক আবার আলির দলে প্রত্যাবর্তন করে এবং অবশিষ্ট লোক আলির শত্রুতায় হঠকারী সিদ্ধান্তে অটল থাকে। তারা যুদ্ধে করে নিজেদের ভ্রষ্ট মতবাদ নিয়ে। মুহাজির ও আনসারগণ তাদের হত্যা করেন।[৩৮]

[৩৮] নাসায়ি প্রণীত ও আহমাদ আল বালুশি সম্পাদিত *খাসায়িসু আমিরিল মুমিনিন আলি বিন আবি তালিব* : ২০০ [সনদ হাসান]।

ইবনে আব্বাস ও খারেজিদের মুনাজারা থেকে প্রাপ্ত শিক্ষা ও উপদেশ

১. **বেদআতি ও কাফের-মুশরিক প্রতিপক্ষের সাথে বিতর্কের জন্য যোগ্য আলেম মনোনয়ন :** আমিরুল মুমিনিন হজরত আলি রা. তাঁর চাচাতো ভাই আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা.-কে মুনাজারার জন্য মনোনীত করেন। তিনি ছিলেন 'উম্মতের শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী' এবং কুরআনের ব্যাখ্যাকারক। তাঁকে মনোনয়নের কারণ হচ্ছে, প্রতিপক্ষ নিজেদের আকিদা প্রমাণে কুরআন থেকে দলিল দিয়ে থাকে। সুতরাং এই মুনাজারায় এমন একজন লোককে মনোনীত করা চাই, যে কুরআন ও তার মর্ম-উদ্দেশ্য সম্পর্কে সম্যক অবগত। নিঃসংকোচে বলা যায়—ইবনে আব্বাস রা. উক্ত মুনাজারায় বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। নিষ্ঠাপূর্ণ ও সহিষ্ণু মনোভাব, প্রতিপক্ষের সাথে কোমল আচরণ ও অবিচলতার সাথে তিনি তাদের সাথে বিতর্ক করেন। তাঁর ভেতর ছিল না আত্মম্ভরিতা ও যুদ্ধংদেহী দৃশ্য। তিনি উভয় পক্ষের কথা শুনেছেন উদার মনে। দৃঢ় প্রমাণের নিরিখে নিজের অভিমত ব্যক্ত করতে সক্ষম হয়েছেন।

২. **বিতর্কের পূর্বে শর্তাবলিতে ঐকমত্য :** যেভাবে আমিরুল মুমিনিন হজরত আলি বিন আবি তালিব রা. এবং তাঁর প্রতিপক্ষ; অর্থাৎ, খারেজিরা এ ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করেছিলেন যে, আল্লাহর কিতাব ও রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাহমতে নিজেদের কর্মকাণ্ড পরিচালিত হবে, অনুরূপভাবে আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা.-ও শর্ত জুড়ে দিয়ে বললেন, 'যদি আমি আল্লাহর কিতাব ও রাসুলের হাদিস থেকে এমন কিছু কথা আপনাদের সামনে পেশ করতে পারি যা আপনারা অস্বীকার করতে পারেন না, তাহলে আপনারা যে বিশ্বাসের ওপর আছেন তা থেকে প্রত্যাবর্তন করবেন কি?' এই শর্ত থাকা সত্ত্বেও আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. মুনাজারার শুরু করার পূর্বে পুনরায় একথা পুনরাবৃত্তি করে স্বীকারোক্তি নেন।

৩. **প্রতিপক্ষের প্রমাণাদি সম্পর্কে অবগতি ও আত্মস্থকরণ :** বিতর্ক শুরুর পূর্বে প্রতিপক্ষের প্রমাণাদি সম্পর্কে পূর্ণ ধারণা রাখা চাই; যাতে উত্তরদানে সম্পূর্ণ প্রস্তুত থাকা যায়। আমাদের বিশ্বাস, আলি

রা. মুনাজারার পূর্বে তাদের দলিল-প্রমাণ সম্পর্কে অবগত হয়েছেন এবং তাঁর সাথিদেরকে কীভাবে জবাব দেওয়া হবে—সে সম্পর্কে বুঝিয়েছেন।

৪. **প্রতিপক্ষের চিন্তাধারা পর্যায়ক্রমে খণ্ডন** : প্রতিপক্ষের চিন্তাধারা পর্যায়ক্রমে একটি একটি করে খণ্ডন করা চাই; যাতে তাদের কোনো প্রমাণ অবশিষ্ট না থাকে। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা.-এর কথোপকথনে আমরা দেখতে পাই—তিনি যখন একটি দলিলের জবাব সম্পন্ন করে যাচ্ছেন, তখন তাদের জিজ্ঞেস করছেন, 'আমি কি আমার প্রমাণ দ্বারা তোমাদের যুক্তি খণ্ডন করতে পারলাম?'

৫. **বিতর্কের শুরুতে এমন ভূমিকা উপস্থাপন করা; যার ফলে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছা সম্ভব হয়** : আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. মুনাজারা শুরু করার পূর্বে বললেন, 'রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চাচাতো ভাই, তাঁর জামাতা এবং তাঁর ওপর প্রথম পর্যায়ে ইমান পোষণকারী ব্যক্তি; অর্থাৎ, আলির প্রতি এমন চরম মনোভাব পোষণ করছেন কেন? অথচ তাঁদের সামনে কুরআন অবতীর্ণ হতো। আপনাদের চেয়ে তাঁরা কুরআনের অর্থ ও মর্ম ভালো বুঝেন। আপনাদের মাঝে তো এমন ব্যক্তি নেই।'[৩৯]

৬. **মুনাজারার সময় প্রতিপক্ষের অভিমতের প্রতি সম্মান প্রদর্শন** : প্রতিপক্ষের রায়কে সম্মান জানানো আবশ্যক; যাতে প্রত্যেকের কথা গভীরভাবে শোনা সম্ভব হয়। খারেজিদের সাথে আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা.-এর বিতর্কের মাঝে খুব স্পষ্টভাবে আমরা তা দেখতে পাই।[৪০]

৭. **মুনাজারার মাধ্যমে সহস্রাধিক খারেজির হকের পথে প্রত্যাবর্তনের সুযোগ** : সহস্রাধিক খারেজির ওপর আল্লাহ তাআলার বিশেষ তাওফিক নসিব হয়। তারা প্রত্যাবর্তন করে সত্যের দিকে। ফলে নাহরাওয়ানের যুদ্ধে ৪ হাজারেরও কম খারেজি অংশ নিতে পেরেছে। তাদের সত্যের পথে প্রত্যাবর্তনের পেছনে প্রথমত

---

[৩৯] *খাসায়িসু আমিরিল মুমিনিন আলি বিন আবি তালিব* : ১৯৭ [সনদ হাসান]।

[৪০] *মানহাজু আলি বিন আবি তালিব ফিদ দাওয়াতি ইলাল্লাহ* : ৩৩৯।

আল্লাহর তাওফিক মূল নিয়ামক হিসেবে কাজ করেছে। দ্বিতীয়ত ইবনে আব্বাস রা.-এর জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও শক্তিশালী দলিলের আলোকে তাদের অনেকের সন্দেহ দূরীভূত হয়ে যায়। তিনি ওইসব আয়াতের তাফসিরের আলোকে জবাব দেন, যা ছিল তাদের মতে বিশুদ্ধ। কুরআনের মর্ম স্পষ্টকারী সুন্নাত দ্বারা খারেজিদের দলিলাদির অসারতা তুলে ধরেছেন তিনি।[৪১]

৮. **ইবনে আব্বাস রা.-এর উক্তি—'তাদের (সাহাবাদের) কোনো সদস্য তো তোমাদের মাঝে নেই'** : এটা ইবনে আব্বাস রা.-এর স্পষ্ট বক্তব্য। তিনি বলেছেন, 'খারেজিদের মধ্যে তো রাসুলের কোনো সাহাবি নেই।' ইবনে আব্বাস রা.-এর এ কথায় খারেজিদের কেউ আপত্তি তুলতে পারেনি। এই বর্ণনাটি বিশুদ্ধ ও প্রমাণিত। আমার জানামতে আহলে সুন্নাত আলেমগণের কেউ এমন বলেননি যে, খারেজিদের মধ্যে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কতেক সাহাবি ছিলেন। সেখানে সাহাবি ছিলেন—এটা খারেজিদের বানোয়াট উক্তি। এর কোনো সঠিক তথ্য তাদের কাছে নেই।

৯. **মুনাজারাকালে ঐকমত্যে পৌঁছা পয়েন্ট হিসেব রাখা** : হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা.-এর কথামালায় এমনটিও দেখা যায় যে, তিনি বললেন, 'যদি আমি আল্লাহর কিতাব ও রাসুলের হাদিস থেকে এমন কিছু কথা আপনাদের সামনে পেশ করতে পারি, যা আপনারা অস্বীকার করতে পারেন না; তাহলে আপনারা যে বিশ্বাসের ওপর আছেন তা থেকে কি প্রত্যাবর্তন করবেন?' জবাবে তারা বলল, 'হ্যাঁ'। এই কথোপকথনে একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা রয়েছে। সেটা হলো, বিতর্কে বিবদমান উভয় পক্ষ ঐকমত্যসম্পন্ন পয়েন্টে রাজি হওয়া আবশ্যক; যাতে করে মুনাজারা শেষে সঠিক ফলাফলে পৌঁছা সহজতর হয়।

---

[৪১] আবদুল হামিদ আলী প্রণীত *খিলাফাতু আলি* : ৩০৭।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

মুনাজারার জন্য আলি রা.-এর বের হওয়া এবং কুফায় তাদের সাথে তাঁর আচরণের ধরন, পুনরায় খারেজিদের দলত্যাগ

হজরত ইবনে আব্বাস রা.-এর মুনাজারার ফলে খারেজিদের মধ্য হতে ২ হাজার লোক ফিরে আসে। এরপর আমিরুল মুমিনিন হজরত আলি রা. নিজেই খারেজিদের কাছে যান এবং তাদের সাথে কথা বলেন। যার ফলে তারা কুফায় ফিরে আসে। কিন্তু এই ঐক্য বেশি সময় টেকেনি। তার কারণ হচ্ছে, কথোপকথনের সময় তারা আলি রা. সম্পর্কে ভেবে নিয়েছিল যে, তিনি সালিশি ঘটনা থেকে রুজু করেছেন; অর্থাৎ, ফিরে এসেছেন এবং নিজ ভুলের জন্য তওবা করেছেন। অথচ এসবই ছিল তাদের খামখেয়ালি। এই খেয়ালিপনা তারা মানুষের মাঝে প্রচারও করছিল। এরই প্রেক্ষিতে আশআস ইবনে কায়স আল কিন্দি আমিরুল মুমিনিন আলি রা.-এর কাছে এসে বলতে লাগল—মানুষ পরস্পর বলাবলি করছে, তাদের কারণে আপনি কুফরি থেকে ফিরে এসেছেন! একথা শুনে আলি রা. জুমআর দিন খুতবা দিলেন। হামদ ও সালাতের পর তিনি খারেজি মতাদর্শী লোকদের সাথে তাঁর মতানৈক্যের স্বরূপ উন্মোচন করেন।[৪২]

এক বর্ণনায় এসেছে; এমন সময়ে এক লোক এসে বলল, لا حكم إلا لله 'আল্লাহ ছাড়া কারও হুকুম নেই'। অতঃপর মসজিদের বিভিন্ন অংশে তারা لا حكم إلا لله স্লোগান দিতে দাঁড়াতে আরম্ভ করে। তিনি হাত দ্বারা তাদের বসতে বলেন। তিনি আরও বলেন, لا حكم إلا لله ঠিক আছে। কিন্তু এর দ্বারা তোমাদের উদ্দেশ্য ভিন্ন। আমি তোমাদের ব্যাপারে আল্লাহর নির্দেশের অপেক্ষায় রয়েছি।[৪৩]

---

[৪২] *মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবাহ* : ১৫/৩১২-৩১৩ [*ইরাআতুল গালিল* : ৮/১১৮ গ্রন্থে খায়খ আলবানি রাহ. বর্ণনাটি বিশুদ্ধ বলে উল্লেখ করেছেন]।

[৪৩] *মারবিয়্যাতু আবি মিখনাফ ফি তারিখিত তাবারি* : ৪৫২।

এভাবে তিনি মিম্বর থেকেই হাতের ইশারায় তাদের বসে যেতে আহ্বান জানান। সে সময় এক ব্যক্তি তার কানে দুই আঙুল ঢুকিয়ে কুরআনের এই আয়াত পড়তে লাগল—

﴿لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾

'যদি আল্লাহর শরিক স্থির করেন, তবে আপনার কর্ম নিষ্ফল হবে এবং আপনি ক্ষতিগ্রস্তদের একজন হবেন।' *-সুরা জুমার : আয়াত ৬৫।*

আমিরুল মুমিনিন তার জবাব দিলেন এই আয়াতের মাধ্যমে—

﴿فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ﴾

'অতএব, আপনি সবর করুন। আল্লাহর ওয়াদা সত্য। যারা বিশ্বাসী নয়, তারা যেন আপনাকে বিচলিত করতে না পারে।' - *সুরা রুম : আয়াত ৬০।*

এরপর আমিরুল মুমিনিন হজরত আলি রা. চরমপন্থী এই দলটি সম্পর্কে নিজের ন্যায়নিষ্ঠ ও প্রজ্ঞাদীপ্ত নীতির ঘোষণা দিলেন। তিনি বললেন, 'যতক্ষণ তোমরা আমাদের সঙ্গে থাকবে, ততক্ষণ তোমরা তিনটি অধিকার পাবে :

- যতক্ষণ তোমরা আল্লাহর জিকর করবে, ততক্ষণ আমরা তোমাদের মসজিদে নামাজ পড়তে বাধা দেবো না।
- যতক্ষণ তোমরা আমাদের সঙ্গে একসাথে যুদ্ধ করবে, ততক্ষণ যুদ্ধলব্ধ সম্পদ অর্জনে তোমাদের বাধা থাকবে না।
- যতক্ষণ তোমরা আমাদের বিরুদ্ধে লড়াই শুরু করবে না, ততক্ষণ আমরা তোমাদের বিরুদ্ধ লড়াই করব না।'[৪৪]

যতক্ষণ পর্যন্ত ওরা খলিফার বিরুদ্ধে যুদ্ধ না করবে বা সাধারণ মুসলমানদের দল থেকে বেরিয়ে না যাবে, ততক্ষণ পর্যন্ত আমিরুল মুমিনিন হজরত আলি রা. তাদেরকে উপরোক্ত তিনটি অধিকার দেন। পাশাপাশি ইসলামি আকিদার ব্যাপারে তিনি তাদের স্বতন্ত্র চিন্তাধারা ও দৃষ্টিভঙ্গিতে হস্তক্ষেপ করেননি।

[৪৪] *মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবাহ* : ১৫/৩২৭-৩২৮; ইমাম শাফেয়ি প্রণীত *আল উম* : ৪/১৩৬; *তারিখে তাবারি* : ৫/৬৮৮ [সনদ জয়িফ। আলবানি রাহ. বলেন, এই সনদের অন্যান্য সাক্ষী ও অনুগামী রয়েছে। *ইরাআতুল গালিল* : ৮/১১৭]

তাদেরকে ইসলাম হতে বের করে দেননি; বরং মতবিরোধের অধিকার প্রদান করেন। তার মানে এই নয় যে, এই মতবিরোধ দলান্ধতা ও অস্ত্রবাজির কারণ হয়ে দাঁড়াবে। তিনি তাদের পিছু ধাওয়া করেননি। তাদের বিরুদ্ধে গুপ্তচরও নিয়োগ দেননি। তাদের বাকস্বাধীনতায় কোনোরূপ হস্তক্ষেপ করেননি। তিনি মনেপ্রাণে চেয়েছিলেন তারা যেন এই ধোঁকা থেকে মুক্তি পায়। সত্যের উন্মেষ যেন তাদের হাতছাড়া না হয়।

একবার তিনি এক ঘোষণাকারীর মাধ্যমে নির্দেশ জারি করলেন, আমিরুল মুমিনিনের দরবারে যেন কেবল ওইসব লোক প্রবেশ করে, যারা পবিত্র কুরআন বহন করে। (হাফেজে কুরআন)।

আমিরুল মুমিনিনের দরবার হাফেজদের সমাগমে পরিপূর্ণ হয়ে গেলে তিনি পবিত্র কুরআনের একটি কপি এনে সবার সম্মুখে রাখলেন। এরপর তিনি হাতের আঙুল দ্বারা পবিত্র কুরআনের ওপর জোরে টোকা মেরে বললেন, 'ওহে কুরআন! তুমি লোকদেরকে তোমার কথা জানাও।'

উপস্থিত লোকজন আলিকে বলল, 'হে আমিরুল মুমিনিন, আপনি পবিত্র কুরআনের কপির কাছে এ কী জিজ্ঞেস করছেন? ও তো কাগজ আর কালি ছাড়া কিছু নয়। আমরা তো ওর মধ্যে যা দেখি তা নিয়ে কথা বলছি। তাহলে এরূপ করার উদ্দেশ্য কী?' তিনি জবাবে বললেন, 'তোমাদের ওইসব সাথি; যারা আমার থেকে পৃথক হয়ে অবস্থান নিয়েছে, তাদের ও আমার মাঝে মহান আল্লাহর কিতাব রয়েছে। মহান আল্লাহ তাঁর কিতাবে একজন পুরুষ ও একজন নারীর ব্যাপারে বলেছেন,

﴿وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا﴾

"যদি তাদের মধ্যে সম্পর্কচ্ছেদ হওয়ার মতো পরিস্থিতিরই আশঙ্কা করো, তবে স্বামীর পরিবার থেকে একজন এবং স্ত্রীর পরিবার থেকে একজন সালিশ নিযুক্ত করবে। তারা উভয়ের মীমাংসা চাইলে আল্লাহ তাদের মধ্যে মীমাংসা ও মিলমিশের পরিবেশ সৃষ্টি করে দেবেন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সবকিছু সম্পর্কে অবহিত।" *-সূরা নিসা আয়াত ৩৫।*

সেক্ষেত্রে হজরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সমস্ত উম্মতের রক্ত ও সম্মান একজন নারী ও একজন পুরুষের তুলনায় অধিক গুরুত্বপূর্ণ। তারা আমার ওপর আরও অভিযোগ এনেছে; আমি মুআবিয়াকে যে চুক্তিপত্র লিখে দিয়েছি, তাতে লিখেছি—"আলি বিন আবি তালিব"। এ ব্যাপারে আমার বক্তব্য হলো, হুদাইবিয়ার সন্ধির সময় কুরাইশদের পক্ষ থেকে সুহাইল ইবনে আমর এলে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন নিজ কওমের সাথে সন্ধিপত্র লেখেন, তখন আমরা তথায় উপস্থিত ছিলাম। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রথমে লিখলেন بسم الله الرحمن الرحيم। সুহাইল আপত্তি জানিয়ে বলল, "আমি بسم الله الرحمن الرحيم-এ রাজি নই"। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, "তাহলে কীভাবে লিখব"? সুহাইল বলল, "লিখবেন باسمك اللهم"। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, "তা-ই লেখো"। সুহাইল সেভাবেই লেখল। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, "এখন লেখো—এই সন্ধিপত্র; যা মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ সম্পাদন করলেন"। সুহাইল বলল, "আমি যদি জানতাম আপনি আল্লাহর রাসুল, তাহলে তো আপনার সাথে আমার কোনো বিরোধই থাকত না"। অবশেষে লেখা হলো—"এই সন্ধিপত্র; যা আবদুল্লাহর ছেলে মুহাম্মাদ কুরাইশদের সাথে সম্পাদন করল"। মহান আল্লাহ আপন কিতাবে ইরশাদ করেন,

﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا﴾

"যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসের আশা রাখে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে, তাদের জন্যে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মধ্যে উত্তম নমুনা রয়েছে।"' *-সুরা আহজাব : আয়াত ২১।*[৪৫]

হজরত আলি রা.-এর এই বক্তব্য শোনার পর খারেজিরা নিশ্চিত হয়ে গেল আলি রা. আবু মুসা আশআরি রা.-কে সালিশ; অর্থাৎ, ফয়সালাকারী (নিজের প্রতিনিধি) মেনে নেওয়ার ব্যাপারে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। খারেজিরা স্বীয় দৃষ্টিভঙ্গি;

---

[৪৫] *মুসনাদে আহমাদ* : ২/৬৫৬ [আহমাদ শাকের বলেছেন, সনদ বিশুদ্ধ]।

অর্থাৎ, 'সালিশ অস্বীকারের' বিষয়টি পুনরায় উপস্থাপন করল। কিন্তু আলি রা. তা অস্বীকার করলেন। তিনি স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিলেন, 'এখন আমাদের এই পদক্ষেপ হবে প্রতিশ্রুতিভঙ্গ ও গাদ্দারির নামান্তর। আমাদের এবং তাদের মাঝে চুক্তিনামা লেখা হয়ে গেছে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন,

﴿وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ﴾

"আল্লাহর নামে অঙ্গীকার করার পর সে অঙ্গীকার পূর্ণ করো এবং পাকাপাকি কসম করার পর তা ভঙ্গ করো না; অথচ তোমরা আল্লাহকে জামিন করেছ। তোমরা যা করো আল্লাহ তা জানেন।"' *-সূরা নাহল : আয়াত ৯১।*

পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে খারেজিরা হজরত আলি রা.-এর সঙ্গ ছেড়ে দিলো। তারা আমির মনোনয়নের সিদ্ধান্ত নিল নিজেদের মাঝে। এ লক্ষ্যে সকল খারেজি সমবেত হয় আবদুল্লাহ ইবনে ওহাব রাসিবির ঘরে। ইবনে ওহাব তাদের উদ্দেশে এক জ্বালাময়ী ভাষণ দেয়। দুনিয়ার মোহ থেকে মুক্ত হতে, আখেরাত ও জান্নাতের প্রতি লালায়িত হতে এবং ভালো কাজের আদেশ ও মন্দ কাজের নিষেধ করতে তাদেরকে উৎসাহিত করে। এরপর সে তাদেরকে বলে—'সালিশের যে ব্যবস্থা করা হয়েছে তা সুস্পষ্ট জুলুম। আমরা এ সালিশ মানি না। যে জনপদের অধিবাসীরা জালিম, সে জনপদ থেকে আমাদের ভাইদের বের করে পার্শ্ববর্তী এই পাহাড়ের কোনো ঘাঁটিতে কিংবা কোনো শহরে নিয়ে চল।'

এরপর হারকুস ইবনে জুহাইর ভাষণ দিতে দাঁড়ায়। মহান আল্লাহর প্রশংসা করার পর বলে—'এই নশ্বর দুনিয়ার সম্পদ খুবই কম। শীঘ্রই এখান থেকে সবাইকে চলে যেতে হবে। এখানকার সৌন্দর্য ও চাকচিক্য যেন তোমাদেরকে আকর্ষণ করতে না পারে। সত্যের দাবি ও জুলুমের উচ্ছেদ কামনা থেকে কোনো কিছুই যেন তোমাদের ফিরিয়ে না রাখে।

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوا وَّالَّذِينَ هُم مُّحْسِنُونَ﴾

"নিশ্চয় আল্লাহ তাদের সঙ্গে আছেন, যারা পরহেজগার এবং যারা সৎকর্ম করে।"' *-সূরা নাহল : আয়াত ১২৮।*

এরপর হামজা ইবনে সিনান আসাদি উঠে বলল, 'ভাইসব, তোমরা যা চিন্তা-উপলব্ধি করেছ এটাই আসল চিন্তা-উপলব্ধি। আর তোমরা যা আলোচনা করছ, এটাই সত্য-সঠিক। এখন এ কাজ পরিচালনার জন্য তোমাদের মধ্য হতে একজনকে আমির নিযুক্ত করো। তোমাদের একটা স্থান দরকার। একটা পতাকার দরকার; যাকে কেন্দ্র করে তোমরা পরিচালিত হবে এবং যার দিকে প্রত্যাবর্তন করবে।'

সিনানের ঘোষণামতে তারা তাদের নেতা জাইদ ইবনে হাসান তায়ি'র নিকট আমির পদ গ্রহণ করার প্রস্তাব পাঠায়। কিন্তু এ পদ গ্রহণ করতে সে অস্বীকৃতি জানায়। এরপর পর্যায়ক্রমে হারকুস ইবনে জুহাইর, হামজা ইবনে সিনান ও শুরাইহ ইবনে আবু আওফা আবাসির নিকট আমিরের পদ গ্রহণ করার প্রস্তাব পাঠানো হয়। কিন্তু সকলেই এ দায়িত্ব নিতে অস্বীকার করে। অবশেষে তারা আবদুল্লাহ ইবনে ওহাব রাসিবির কাছে প্রস্তাব দিলে সে গ্রহণ করে এবং বলে, 'আল্লাহর কসম! দুনিয়ার লোভে অমি এ পদ গ্রহণ করছি না। আর মৃত্যু থেকে পালাবার ভয়ে ছাড়তেও পারছি না।'[৪৬]

এরপর তাদের দ্বিতীয় সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয় জায়দ ইবনে হাসান তায়ি সানাসির ঘরে। সেখানে ইবনে ওহাব তাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিয়ে সৎ কাজের আদেশ ও মন্দ কাজের নিষেধে তৎপর হতে উদ্বুদ্ধ করে। এ উপলক্ষে সে পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন আয়াত পড়ে শোনায়। যথা :

﴿يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ﴾

'হে দাউদ, আমি তোমাকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি করেছি, অতএব, তুমি মানুষের মাঝে ন্যায়সঙ্গতভাবে রাজত্ব করো এবং খেয়াল-খুশির অনুসরণ করো না। তা তোমাকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করে দেবে। নিশ্চয় যারা আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত হয়, তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি; এ কারণে যে, তারা হিসাবদিবসকে ভুলে যায়।' *-সুরা সাদ : আয়াত ২৬।*

---

৪৬ *আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া : ৭/৩১২; তারিখে তাবারি : ৫/৬৮৯।*

﴿وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾

'যেসব লোক আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, তদনুযায়ী ফয়সালা করে না, তারাই কাফের ।' -*সুরা মায়েদা : আয়াত ৪৪ ।*

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন,

﴿وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾

'যেসব লোক আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, তদনুযায়ী ফয়সালা করে না তারাই জালেম ।' -*সুরা মায়েদা : আয়াত ৪৫ ।*

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন,

﴿وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾

'যারা আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, তদনুযায়ী ফয়সালা করে না, তারাই পাপাচারী ।' -*সুরা মায়েদা : আয়াত ৪৭ ।*

এরপর সে বলল, 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আমাদের একই কিবলার অনুসারী; যাদের কাছে আমরা দাওয়াত পৌঁছাতে চাই, তারা নিজেদের খেয়াল-খুশির অনুসরণ করে চলছে। কিতাবের বিধানকে উপেক্ষা করছে এবং কথায় ও কাজে জুলুমের আশ্রয় নিয়েছে। এদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা মুমিনদের ওপর ফরজ ।'

এ ভাষণ শুনে আবদুল্লাহ ইবনে শাজারাহ আসসুলামি নামের জনৈক খারেজি ক্রন্দন করতে থাকে। এরপর সে তাদেরকে যুদ্ধে বেরিয়ে পড়ার জন্য উত্তেজনাকর ভাষণ দেয়। ভাষণে বলে, 'আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তোমরা ওদের মুখে ও কপালে তলোয়ার মারো। যদি তোমরা আল্লাহর ইচ্ছার বিজয় লাভ করো, তাহলে তিনি তোমাদেরকে তার হুকুম পালনকারীদের সমান সওয়াব দেবেন। আর যদি তোমরা মারা যাও, তাহলে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও জান্নাতের দিকে যাওয়ার চেয়ে অধিক ফজিলতের কাজ আর কী থাকতে পারে?'[৪৭]

---

[৪৭] *আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া : ৭/৩১২ ।*

হাফেজ ইবনে কাসির রাহ. খারেজিদের মন-মস্তিষ্কে শয়তানের উপরোক্ত প্ররোচনার বিষয় আলোকপাতের পর লিখেন, খারেজিরা ছিল বনি আদমের মধ্যে এক ব্যতিক্রমী সৃষ্টি। পবিত্র সেই সত্তা, যিনি তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী বিভিন্ন শ্রেণিতে তাঁর সৃষ্টিকে বিভিন্ন রূপ দান করেছেন এবং তাঁর মহাশক্তির প্রকাশ ঘটিয়েছেন।

জনৈক প্রাচীন মনীষী কতই-না ভালো উক্তি করেছেন। তিনি বলেছেন, পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতে খারেজিদের কথাই উল্লেখ করা হয়েছে—

﴿قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا *الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا *أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا﴾

'বলুন, আমি কি তোমাদেরকে সেসব লোকের সংবাদ দেবো, যারা কর্মের দিক দিয়ে খুবই ক্ষতিগ্রস্ত। তারাই সে লোক, যাদের প্রচেষ্টা পার্থিবজীবনে বিভ্রান্ত হয়, অথচ তারা মনে করে—তারা সৎকর্ম করেছে। তারাই সে লোক, যারা তাদের পালনকর্তার নিদর্শনাবলি এবং তার সাথে সাক্ষাতের বিষয় অস্বীকার করে। ফলে তাদের কর্ম নিষ্ফল হয়ে যায়। সুতরাং কেয়ামতের দিন তাদের জন্য আমি কোনো গুরুত্ব স্থির করব না।' *-সুরা কাহাফ : আয়াত ১০৫।*

মোটকথা, খারেজিদের এ দলটি ভ্রান্তির ঘোর অন্ধকারে নিমজ্জিত। কথায় ও কাজে তারা অত্যন্ত রুষ্ট ও রুক্ষ। আলোচনা শেষে তারা ঐকমত্যে পৌঁছে যে, মুসলমানদের এ এলাকা ছেড়ে মাদায়েন শহরে চলে যাবে। তাদের যুক্তি—মাদায়েন শহর তারা দখল করে সেখানে নিরাপত্তা-দুর্গ তৈরি করবে। সেখান থেকে বসরা ও অন্যান্য স্থানে তাদের সম-আদর্শের যেসব লোকজন ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে তাদেরকে এখানে জড়ো করবে।

এই পরিকল্পনা যখন প্রায় চূড়ান্ত তখন জায়দ ইবনে হাসান তায়ি বলল, 'তোমরা মাদায়েন দখল করতে পারবে না। সেখানে দুর্ধর্ষ সেনাবাহিনী আছে। তাদেরকে তোমরা কিছুতেই পর্যুদস্ত করতে পারবে না। তারা

তোমাদের তাড়িয়ে দেবে। বরং আমার পরামর্শ হলো, তোমরা তোমাদের সকল সাথি-বন্ধুদের নিয়ে জাওখি পুলের কাছে সমবেত হতে বলো।' জায়দ আরও বলল, 'কুফা থেকে তোমরা দলবদ্ধভাবে বের হয়ো না; বরং একজন একজন করে বের হও; যাতে কেউ তোমাদের বিষয়টি বুঝতে না পারে।' এ পরামর্শ সকলের পছন্দ হয়।

তাই তারা বসরা ও অন্যান্য স্থানে বসবাসকারী তাদের অনুসারীদের নিকট পত্রসহ লোক পাঠাল; যেন তারা দ্রুত 'নাহরে' গিয়ে সমবেত হয়। শত্রুদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ একক শক্তিতে পরিণত হওয়ার জন্য এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এরপর তারা পর্যায়ক্রমে একে একে বের হয়ে যায়। কেউ যাতে তাদের উদ্দেশ্য জানতে পেরে বাধা দিতে না পারে সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা হয়।

নিজেদের পিতা-মাতা, মামা-খালাসহ সকল পর্যায়ের আত্মীয়দের পশ্চাতে ফেলে এই সুধারণা নিয়ে তারা পৃথক হয়ে যায় যে, এর দ্বারাই আসমান-জমিনের প্রতিপালক তাদের ওপর সন্তুষ্ট হবেন। বস্তুত এটা ছিল তাদের চরম মূর্খতা এবং ইলম ও জ্ঞানের স্বল্পতারই পবিচায়ক। ওরা বুঝতে পারেনি—এটা ছিল তাদের ধ্বংসাত্মক পদক্ষেপ। সকল কবিরা গোনাহের মধ্যে মারাত্মক কবিরা গোনাহ। মারাত্মক ভুল সিদ্ধান্ত। অভিশপ্ত শয়তানই তাদের নিকট এ জঘন্য কাজকে আকর্ষণীয় ভালো কাজ হিসেবে দেখায়। শয়তান যখন আসমান থেকে বিতাড়িত হয়, তখনই সে পিতা আদমের বিরুদ্ধে এবং তার পরে তাঁর সন্তানদের বিরুদ্ধে জীবনব্যাপী শত্রুতার সিদ্ধান্ত নেয়। মহান আল্লাহর নিকট আমরা শয়তানের ধোঁকা থেকে রক্ষা পাওয়ার প্রার্থনা জানাই।

রওনা হয়ে আসা লোকদের একটি দল তাদের সন্তান ও ভাইদেরকে ভয়-ভীতি ও তিরস্কার করে ফিরিয়ে দেয়। তবে তাদের এক অংশ স্থির থেকে যায় আর কিছু অংশ পালিয়ে খারেজিদের সাথে মিলিত হয়ে চিরস্থায়ী ক্ষতির সম্মুখীন হয়। অবিশষ্টরা ওই স্থানে চলে যায়।

বসরা ও অন্যান্য জায়গায় যাদের কাছে পত্র দেওয়া হয়েছিল তারা এদের কাছে চলে আসে। এভাবে তাদের সকল জনশক্তি নাহরাওয়ানে এসে

একত্রিত হয়। এখানে তারা বিরাট শক্তি ও প্রতিরোধ-ক্ষমতা গড়ে তোলে।[৪৮]

এদিকে সালিশ যখন কোনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারল না, তখন আলি রা. নাহরাওয়ানে সমবেত খারেজিদের নামে একটি চিঠি পাঠালেন। তিনি লিখলেন, 'সালিশ চূড়ান্ত কোনো সিদ্ধান্তে আসতে পারেনি। ব্যাপারটি এখানেই শেষ। সুতরাং তোমরা পূর্বের অবস্থায় ফিরে আসো এবং আমাদের সঙ্গে সিরিয়াবাসীর বিরুদ্ধে লড়াই করো।' কিন্তু খারেজিরা এই বলে তা প্রত্যাখ্যান করল যে, 'যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি আপনার কুফরি স্বীকার না করবেন এবং সে ব্যাপারে তওবা না করবেন, ততক্ষণ আমরা ফিরে আসব না।' আলি রা. এ ব্যাপারে অস্বীকৃতি জানালেন।[৪৯]

আরেক বর্ণনায় এসেছে, আলি রা.-এর চিঠি পেয়ে তারা জবাবে লিখল, 'আপনি মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে রাগ করেননি; বরং আপনার নিজের স্বার্থের জন্যে রাগ করেছেন। কাজেই আপনি যদি নিজেকে কাফের বলে স্বীকার করেন এবং সেজন্য তওবা করেন, তবে আমরা আপনার এ আহ্বান নিয়ে বিবেচনা করব। অন্যথায় আপনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার ঘোষণা দিচ্ছি। নিশ্চয়ই আল্লাহ চুক্তি ভঙ্গকারীদেরকে পছন্দ করেন না।'

আলি রা. তাদের চিঠি পাঠ করে তাদের ব্যাপারে নিরাশ হয়ে গেলেন। এখন তিনি সিরিয়ার বিরুদ্ধে মোকাবিলা করতে দৃঢ়-সংকল্প গ্রহণ করেন।

উল্লেখ্য, খারেজিদের পক্ষ থেকে আলি রা.-কে কাফের বলা এবং তাঁর কাছে তওবা চাওয়ার ঘোষণা ওইসব বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত নয়। তবুও এটা অবশ্য বলা যেতে পারে যে, এসব বর্ণনা আলি ও উসমান রা.-কে কাফের বলা এবং এর প্রেক্ষিতে অন্যান্য মুসলমানদের দুর্দশায় নিক্ষেপ করা-সংক্রান্ত বর্ণনারই প্রতিধ্বনি বহন করে।[৫০]

---

[৪৮] *আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া* : ৭/৩১২, ৩১৩।
[৪৯] *আনসাবুল আশরাফ* : ২/৬৩ [বর্ণনাটির সনদ জয়িফ হলেও এর অন্যান্য অনুগামী সাক্ষ্য রয়েছে]।
[৫০] আবদুল হামিদ আলি প্রণীত *খিলাফাতু আলি ইবনে আবি তালিব* : ৩১৯।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

নাহরাওয়ান অভিযান

এক. অভিযানের নেপথ্যে

আমিরুল মুমিনিন হজরত আলি রা. খারেজিদেরকে তাদের মতাদর্শ নিয়ে এই শর্তে থাকতে দেন যে, তারা অন্যায়ভাবে কারও রক্ত ঝরাতে পারবে না। সাধারণ জনগণকে ভীতসন্ত্রস্ত করতে পারবে না। কোনো মুসাফিরের পথ আটকাতে পারবে না। যদি এই শর্তাবলির ব্যত্যয় ঘটে তবে যুদ্ধই হবে এর সমাধান। কিন্তু খারেজিরা তাদের প্রতিপক্ষকে কাফের আখ্যা দেওয়ার প্রেক্ষিতে তাদের রক্ত ও সম্পদ বৈধ মনে করতে লাগল। তারা মুসলমানদের রক্ত ঝরাতে আরম্ভ করল অন্যায়ভাবে। তাদের এসব অন্যায়-অনাচার সম্পর্কে বহু বর্ণনা রয়েছে। তবে সর্বাধিক বিশুদ্ধ বর্ণনা হচ্ছে যেটা প্রত্যক্ষদর্শী বর্ণনা করেছে। এই লোক শুরুতে ছিল খারেজি। পরে তওবা করে ফিরে আসে। তার বর্ণনা—আমি নাহরওয়ালাদের সঙ্গে ছিলাম। কিন্তু তাদের কর্মকাণ্ড আমার ভালো লাগল না। তবুও তাদের ভয়ে আমার ভালো না-লাগার বিষয়টি গোপন রাখতে বাধ্য হই। কেননা, তখন তারা আমাকে হত্যা করবে—এই আশঙ্কা ছিল আমার।

একদিন তাদের একটি দলের সাথে একটি গ্রাম দিয়ে কোথাও যাচ্ছিলাম। আমাদের এবং ওই গ্রামের মাঝখানে অন্তরায় ছিল একটি খাল। অতর্কিত এক ব্যক্তি স্বীয় চাদর পেঁচিয়ে অত্যন্ত ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে গ্রামের বাইরে বের হলো। আমাদের দলের লোকজন তাকে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি সম্ভবত আমাদের দেখে ভয় পেয়েছ?' সে বলল, 'হ্যাঁ'। তারা বলল, 'ভয় পেয়ো না।' আমি মনে মনে বললাম, নিশ্চয় এরা এই লোককে চিনে ফেলেছে। অতঃপর তারা জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কি আল্লাহর রাসুলের সাহাবি খাব্বাবের ছেলে'? তিনি বলল, 'হ্যাঁ'। তারা বলল, 'তুমি তোমার পিতার থেকে যে হাদিসটি শুনেছ তা আমাদেরকে শোনাও।'

তিনি বললেন, 'আমি আমার পিতার কাছে শুনেছি; তিনি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছেন—"শীঘ্রই এমন সময় আসবে যখন ঘরে অবস্থানকারী ব্যক্তি দণ্ডায়মান ব্যক্তি থেকে ভালো অবস্থায় থাকবে। আর দণ্ডায়মান ব্যক্তি হেঁটে চলা ব্যক্তি থেকে ভালো অবস্থায় থাকবে। আবার হেঁটে চলা ব্যক্তি দৌড়ে চলা ব্যক্তি থেকে ভালো অবস্থায় থাকবে।"'[৫১]

এরপর তারা তাঁর এবং তাঁর একজন বাঁদির হাতে বেড়ি পরিয়ে সাথে নিয়ে চলল। পথিমধ্যে একটি খেজুর গাছ থেকে একটি খেজুর পড়তে দেখে দলের একজন খেজুরটি উঠিয়ে মুখে পুরে দেয়। অন্য একজন তাকে বলল, 'খেজুরটি তুমি খেয়ে ফেললে, অথচ মালিকের অনুমতিও নাওনি; মূল্যও দাওনি।' তখন সে ব্যক্তি মুখের ভেতর থেকে খেজুরটি ফেলে দিলো। আরও কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার পর জনৈক জিম্মির একটি শূকর দেখে তাদের একজন শূকরটিকে মেরে চামড়া ছিলে ফেলল। অন্য একজন তাকে বলল, 'তুমি এ কাজ করলে কেন? এটা কোনো জিম্মির মালিকানাধীন শূকর হতে পারে।'

এরপর আবদুল্লাহ ইবনে খাব্বাব বললেন, 'আমি কি তোমাদেরকে ওই কথা বলব না, যা তোমার দৃষ্টিতে এটা অপেক্ষা পবিত্র ও সম্মানযোগ্য?' তারা বলল, 'অবশ্যই বলবে'। তিনি বললেন, 'আমি একজন মুসলমান। আমি ইসলামে কোনো প্রকার বেদআত আবিষ্কার করিনি। তোমরা আমাকে নিরাপত্তা দিয়ে বলেছ—ভয় পেয়ো না।'

এতদ্‌সত্ত্বেও তারা আবদুল্লাহ ইবনে খাব্বাবকে নদীর কাছে টেনে নিয়ে গলা কেটে শহিদ করে দেয়।

বর্ণনাকারী বলেন, আমি তাঁর রক্ত পানিতে এমনভাবে জমাটবদ্ধ হয়ে বয়ে যেতে দেখলাম, যেভাবে পানিতে ছিঁড়ে যাওয়া জুতার ফিতা ভেসে ভেসে অদৃশ্য হয়ে যায়। এরপর তারা তাঁর স্ত্রীর কাছে যায়। স্ত্রী তাদের বলল, 'আমি অন্তঃসত্ত্বা, আল্লাহকে ভয় করো।' পাষণ্ডরা তাঁর কোনো কথায় কর্ণপাত না করে তাঁকে জবাই করে পেট ফেঁড়ে সন্তান বের করে দেয়।

---

[৫১] মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবাহ : ১৫/৩১০, ৩১১ [সনদ বিশুদ্ধ]।

বর্ণনাকারী বলেন, আমি তাদের চেয়ে অভিশপ্ত আর কোনো জাতি দেখিনি। তাই সুযোগ পেয়ে তাদের দল থেকে বেরিয়ে এসেছি।[৫২]

খারেজিরা এক রক্তক্ষয়ী পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। গর্ভবতী নারীর পেট কেটে সন্তান বের করে ফেলা এবং বকরির মতো আবদুল্লাহ ইবনে খাব্বাবকে জবাই করা সাধারণ বিষয় নয়। এরা এতেই ক্ষান্ত হলো না; বরং জনগণকে হত্যার হুমকিও দিয়ে যাচ্ছে। তাদের এমন ধৃষ্টতাপূর্ণ অনাচার দেখে তাদের নিজেদেরই কিছু লোক ব্যাপারটা সহজে নিতে পারল না। তারা বলল, 'তোমাদের সর্বনাশ হোক! এ জন্য আমরা আলিকে ছেড়ে তোমাদের সঙ্গ দিইনি'।[৫৩]

যাইহোক, ক্রমেই বেড়ে চলল খারেজিদের এমন ধ্বংসযজ্ঞের মাত্রা। তবুও আলি রা. তাদের হত্যার পদক্ষেপ নেননি। তিনি তাদের কাছে নিজের প্রতিনিধি পাঠালেন। বললেন, 'কিসাস নেওয়ার জন্য হত্যাকারীকে যেন আমাদের কাছে সোপর্দ করে দেওয়া হয়।' জবাবে তারা চরম ঔদ্ধত্য ও ধৃষ্টতা দেখায়। তারা বলল, 'আমরা সবাই হত্যাকারী।'[৫৪]

এমতাবস্থায় হজরত আলি রা. ৩৮ হিজরি সনে যে বাহিনী সিরিয়া অভিযানের উদ্দেশ্যে প্রস্তুত রেখেছিলেন, তাঁদের নিয়ে খারেজিদের উদ্দেশে চললেন।[৫৫] নাহরাওয়ান নদীর পশ্চিমতীরে বাহিনী অবতরণ করালেন। অন্যদিকে নাহরাওয়ান শহরের পূর্বদিকে ছিল খারেজিদের ক্যাম্প।[৫৬]

দুই. যুদ্ধের জন্য নিজ বাহিনীকে আমিরুল মুমিনিনের উদ্বুদ্ধকরণ

আমিরুল মুমিনিন হজরত আলি রা. ভালো করে জানতেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে গোষ্ঠী সম্পর্কে দীন থেকে বেরিয়ে যাবার ব্যাপারে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, তারা হচ্ছে এই খারেজি সম্প্রদায়। অতএব, তিনি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদিসের

---

[৫২] *মাজমাউজ জাওয়ায়িদ* : ৬/১৩৭, ১৩৮ [সনদ বিশুদ্ধ]।
[৫৩] *মাজমাউজ জাওয়ায়িদ ওয়া মামবাউল ফাওয়ায়িদ* : ৬/২৩৭, ২৩৮ [সনদ বিশুদ্ধ]।
[৫৪] *মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবাহ* : ১৫/৩০৮, ৩০৯ [সনদ বিশুদ্ধ]।
[৫৫] *আনসাবুল আশরাফ* : ২/৬৩ [সনদে অজ্ঞাত রাবি আছেন। দ্রষ্টব্য- আবদুল হামিদ প্রণীত *খিলাফাতে আলি* : ৩২২]।
[৫৬] *তারিখে বাগদাদ* : ১/২০৫, ২০৬।

মাধ্যমে সাহাবায়ে কেরাম এবং তাঁর সঙ্গীদেরকে তাদের বিরুদ্ধ লড়াই করার জন্য উদ্দীপনা যোগাচ্ছিলেন। তাদের মুখোমুখী হয়ে বিপদশঙ্কুল পরিস্থিতি মোকাবিলার প্রেরণা দিতে গিয়ে তিনি এই হাদিসটি শোনাচ্ছিলেন। বলছিলেন, 'হে লোকসকল, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি—

يَخْرُجُ قَوْمٌ مِنْ أُمَّتِي يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لَيْسَ قِرَاءَتُكُمْ إِلَى قِرَاءَتِهِمْ بِشَيْءٍ وَلاَ صَلاَتُكُمْ إِلَى صَلاَتِهِمْ بِشَيْءٍ وَلاَ صِيَامُكُمْ إِلَى صِيَامِهِمْ بِشَيْءٍ يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ يَحْسِبُونَ أَنَّهُ لَهُمْ وَهُوَ عَلَيْهِمْ لاَ تُجَاوِزُ صَلاَتُهُمْ تَرَاقِيَهُمْ يَمْرُقُونَ مِنَ الإِسْلاَمِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ

"আমার উম্মতের মধ্যে এমন এক সম্প্রদায়ের আবির্ভাব ঘটবে যারা কুরআন পাঠ করবে। তোমাদের পাঠ তাদের পাঠের তুলনায় নিম্নমানের হবে। অনুরূপভাবে তাদের নামাজ ও রোজার তুলনায় তোমাদের নামাজ-রোজা সামান্য বলে মনে হবে। কুরআন পাঠ করে তারা ধারণা করবে এতে তাদের খুব লাভ হচ্ছে। অথচ এটা তাদের জন্য ক্ষতির কারণই হবে। তাদের নামাজ তাদের কণ্ঠনালি অতিক্রম করবে না। তারা ইসলাম থেকে এমনভাবে বেরিয়ে যাবে যেমন তীর বেরিয়ে যায় শিকার থেকে।"

আর যে সৈন্যদল তাদের বিরুদ্ধে অভিযান চালাবে সে সৈন্যদল যদি তাঁদের নবির মাধ্যমে কৃত ওয়াদা সম্পর্কে জানতে পারত, তাহলে তাঁরা এই কাজের (পুরস্কারের) ওপরই ভরসা করে বসে থাকত।

দলটির চিহ্ন হলো, তাদের মধ্যে এমন এক লোক থাকবে, যার বাহুর অগ্রভাগে স্ত্রীলোকের স্তনের বোটার ন্যায় একটি মাংসপেশী থাকবে। এর ওপর থাকবে সাদা পশম।

আলি রা. বলেন, 'অতএব তোমরা মুআবিয়া ও সিরিয়ার অধিবাসীদের বিরুদ্ধে অভিযানে যাচ্ছ; অপরদিকে তোমরা নিজেদের সন্তান-সন্ততি ও ধন-সম্পদের পেছনে এদের (খারেজি) রেখে যাচ্ছ। আল্লাহর শপথ! আমার

বিশ্বাস, এরাই হচ্ছে সেই সম্প্রদায় (যাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করার ব্যাপারে তোমাদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে)। কেননা, এরা অবৈধভাবে রক্তপাত ঘটিয়েছে এবং মানুষের গবাদি পশু লুট করেছে। সুতরাং আল্লাহর নাম নিয়ে যাত্রা শুরু করো।'[৫৭]

নাহরাওয়ানের দিন হজরত আলি রা. বলেছেন, 'আমাকে মারিকিন; অর্থাৎ, দীনত্যাগী মানুষদের হত্যা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আর এরা মারিকিনদের অন্তর্ভুক্ত।'[৫৮]

আলি রা. নাহরাওয়ানের এপাড়ে; অর্থাৎ, পূর্বপাশে খারেজিদের বিপরীতে সেনা মোতায়েনের নির্দেশ দেন। বলেন, 'খারেজিরা যতক্ষণ নদী পার হয়ে পশ্চিম দিকে না আসবে ততক্ষণ লড়াই শুরু করবে না।' তিনি একজন দূত পাঠালেন তাদের কাছে। বললেন, 'তাদেরকে ফিরে যেতে বলো।' হজরত বারা ইবনে আজেব রা.-কে এ লক্ষ্যে প্রেরণ করা হয়। তিনি তিনদিন ধরে তাদের বোঝালেন; কিন্তু তারা তা মান্য করল না।[৫৯]

এভাবে আলি রা. খারেজিদের কাছে কয়েকজন দূত পাঠান। দূতেরা আসা-যাওয়া করতে লাগল। দেখা গেল, একজন দূতকে তারা হত্যাই করে ফেলেছে এবং তাঁর লাশ নদীর পূর্বপাশে ফেলে দিয়েছে।[৬০]

খারেজিদের অনাচার আর বাড়াবাড়ি সীমা অতিক্রম করে চলল। যুদ্ধ ঠেকানো ও সন্ধির সমুদয় পথ রুদ্ধ। তারা হকের পথে আহ্বানকারীদের যাবতীয় প্রচেষ্টাকে খুবই দাম্ভিকতার সাথে প্রত্যাহার করল এবং যুদ্ধের জন্য জেদ ধরে বসল। এমতাবস্থায় আলি রা. নিজ বাহিনী সজ্জিত করে অভিযানের প্রস্তুতি নিতে নির্দেশ দিলেন।[৬১]

হজরত আলি রা. তাঁর সৈন্যবাহিনীর মাইমানাহ অংশে হুজর ইবনে আদিকে, মাইসারাহ অংশে শাবস ইবনে রিবয়ি এবং মাকিল ইবনে কায়স রায়াহিকে,

---

[৫৭] সহিহ মুসলিম : ৭৪৮, ৭৪৯।

[৫৮] আবু আসিম প্রণীত আসসুন্নাহ, গবেষক আলবানি বলেন, হাদিসটি বিশুদ্ধ তবে সনদ দুর্বল। কিন্তু এর অন্যান্য সাক্ষ্য রয়েছে। *খিলাফাতু আলি* : ৩২৩।

[৫৯] বায়হাকি প্রণীত *আসসুনানুল কুবরা* : ৮/১৯৭; আবদুল হামিদ প্রণীত *খিলাফাতু আলি* : ৩২৪।

[৬০] মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবাহ : ১৫/৩২৫, ৩২৭।

[৬১] আবদুল হামিদ প্রণীত *খিলাফাতু আলি* : ৩২৪।

অশ্বারোহী অংশে আবু আইয়ুব আনসারিকে, পদাতিক অংশে আবু কাতাদাহ আনসারিকে এবং মদিনা থেকে আগত ৭০০ সৈন্যের ওপর কায়স ইবনে সাআদ ইবনে উবাদাকে দায়িত্বশীল নিযুক্ত করেন। এই ব্যবস্থা গ্রহণের পর হজরত আলি রা. আবু আইয়ুব আনসারি রা.-কে একটি নিরাপত্তা-ঝাণ্ডা স্থাপনের নির্দেশ দেন এবং খারেজিদের উদ্দেশে এই ঘোষণা দিতে বলেন যে, 'যারা এই ঝাণ্ডার নিচে এসে দাঁড়াবে তারা নিরাপদ। যারা কুফা বা মাদায়েনে চলে যাবে তারাও নিরাপদ। তোমাদের মধ্যে যারা আমাদের ভাইদের হত্যা করেছে তারা ছাড়া অন্য কারও সাথে যুদ্ধ করার প্রয়োজন আমাদের নেই।'

এ ঘোষণার পর খারেজিদের মধ্য হতে বহুসংখ্যক লোক ফিরে আসে, যাদের সংখ্যা প্রায় ৪ হাজার। আর আবদুল্লাহ ইবনে ওহাব রাসিবির নেতৃত্বে অবশিষ্ট থাকে মাত্র ১ হাজার কিংবা তার চেয়েও কম খারেজি। তারা মাইমানাহ (দক্ষিণ) দলে জায়দ ইবনে হাসান তায়িকে, মাইসারাহ (বাম) দলে শুরাইহ ইবনে আওফাকে, অশ্বারোহী দলে হামজা ইবনে সিনানকে এবং পদাতিক দলে হারকুস ইবনে জুহাইর সাদিকে যুদ্ধ পরিচালনার দায়িত্বে নিয়োজিত করে।[৬২]

তিন. যুদ্ধের সূচনা

খারেজিরা আলি রা.-এর দিকে অগ্রসর হলো। আলি রা. তাঁর অশ্বারোহী বাহিনী সম্মুখে রাখলেন। তাঁদের কাছে রাখলেন তিরন্দাজ বাহিনী। আর পদাতিক বাহিনী রাখলেন অশ্বারোহীদের পশ্চাতে। এরপর তিনি তাঁর সৈন্যবাহিনীকে নির্দেশ দিলেন, 'ওরা তোমাদের ওপর হামলা শুরু না করা পর্যন্ত তোমরা সংযত থাকবে।'

ইতোমধ্যে খারেজিরা لا حكم إلا لله، الرواح الرواح إلى الجنة 'আল্লাহ ছাড়া কারও বিচারের অধিকার নেই। চলো চলো জান্নাতে চলো' বলতে বলতে আলি রা.-এর বাহিনীর সম্মুখভাগে অশ্বারোহী দলের ওপর আক্রমণ চালিয়ে দিলো। এ আক্রমণ তাঁদেরকে ছত্রভঙ্গ করে দিলো। এমনকি এদের একদল মাইমানায় এবং অপর দল মাইসারায় চলে গেল। এবার তাদের মোকাবিলা

[৬২] মুহাম্মাদ কিনান প্রণীত *তারিখুল খিলাফাতির রাশিদা* : ৪২৫, *আলবিদায়া ওয়ান নিহায়া* হতে ঈষৎ সংক্ষেপিত।

করল তিরন্দাজ বাহিনী। এরা তাদের মুখের ওপর তির ছুঁড়তে লাগল। মাইমানাহ ও মাইসারাহ থেকে এদের সাহায্যে এগিয়ে আসে অশ্বারোহী দল। পদাতিক বাহিনীও বর্শা ও তরবারি নিয়ে দ্রুত ঝাঁপিয়ে পড়ল। এভাবে ত্রিমুখী আক্রমণ চালিয়ে খারেজিদের সমূলে বিনাশ করে দেওয়া হয়। তাদের মৃতদেহগুলো অশ্বের খুরের নিচে পড়ে থাকে। যুদ্ধে খারেজিদের নেতৃবৃন্দ যথা : আবদুল্লাহ ইবনে ওহাব, হারকুস ইবনে জুহাইর, শুরাইহ ইবনে আওফা ও আবদুল্লাহ ইবনে সাখবুরাহ সুলামি নিহত হয়।[৬৩]

হজরত আবু আইয়ুব আনসারি রা. বলেন, যুদ্ধের সময় এক খারেজিকে আমি বর্শা মারি। বর্শা তার পেট ভেদ করে পিঠ দিয়ে বেরিয়ে যায়। আমি বললাম, 'হে আল্লাহর দুশমন, দোজখের সুসংবাদ গ্রহণ করো।' সে বলল, 'অচিরেই তুমি জানতে পারবে; আমাদের মধ্যে দোজখে যাওয়ার অধিক যোগ্য কে?'[৬৪]

বহু খারেজি আত্মসমর্পণ করে এই যুদ্ধে। কেননা, তারা তাদের নেতা আবদুল্লাহ ইবনে ওহাবের মুখে এমন একটি কথা বলতে শুনেছে, যা দ্বারা তার পরিণাম সম্পর্কে সৃষ্টি হয়েছে ধুম্রজাল। তার ভেতর থেকে আসছিল মন্দ পরিণামের গন্ধ। সে এমন উক্তিটি ওই সময় করে যখন আলি রা. তাঁর তরবারি দ্বারা একজন খারেজিকে আঘাত করেছেন। সে বলল, 'খোশ আমদেদ! কতই-না উত্তম জান্নাতের সফর!' তার একথা শুনে আবদুল্লাহ ইবনে ওয়াহাব বলতে লাগল, 'জানা নেই জান্নাতের সফর নাকি জাহান্নামের।'[৬৫]

আবদুল্লাহ ইবনে ওহাবের এই উক্তি শুনে বনু সাআদের ফারওয়া ইবনে নাওফেল বলল, 'এই লোক ধোঁকায় পতিত হয়েছে। আমার মনে হচ্ছে, সে নিজেই সন্দেহে পতিত।' অতঃপর সে তার সঙ্গীদের নিয়ে ১ হাজার খারেজির সাথে আবু আইয়ুব আনসারি রা.-এর ঝাণ্ডার নিচে আশ্রয় নেয়। পরে পর্যায়ক্রমে আত্মসমর্পণ করে এখানে চলে আসে বহুসংখ্যক খারেজি।[৬৬]

---

[৬৩] মুহাম্মাদ কিনান প্রণীত *তারিখুল খিলাফাতির রাশিদা* : ৪২৫।
[৬৪] মুহাম্মাদ কিনান প্রণীত *তারিখুল খিলাফাতির রাশিদা* : ৪২৫।
[৬৫] *আল কামিল-আখবারুল খাওয়ারিজ* : ২১; আবদুল হামিদ প্রণীত *খিলাফাতু আলি* : ৩১৫।
[৬৬] *আল কামিল-আখবারুল খাওয়ারিজ* : ২১।

চূড়ান্ত এই লড়াইয়ের মেয়াদ ছিল মাত্র কয়েক ঘণ্টা—যা সংঘটিত হয় ৩৮ হিজরির সফর মাসে।[৬৭] সংক্ষিপ্ত এই সময়টাতে খারেজিদের বিশাল একটি অংশ ধূলিসাৎ হয়ে যায়। অন্যদিকে *সহিহ মুসলিম*-এর বর্ণনায় জায়দ ইবনে ওহাবের ভাষ্যমতে, আলি রা.-এর বাহিনীর মাত্র ২ জন লোক,[৬৮] 'হাসান' সনদের আরেক বর্ণনামতে মোট ১২ বা ১৩ জন লোক শহিদ হন।[৬৯] তৃতীয় আরেকটি বিশুদ্ধ বর্ণনায় এসেছে; আবু মাজলাজ বলেছেন, মুসলমান অর্থাৎ, আলি রা.-এর বাহিনীর মাত্র ৯ জন লোক শহিদ হয়। তিনি বলেন, এর সত্যতা যাচাই করতে চাইলে আবু বারজা'র কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করো। তিনি ওই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন।[৭০]

এদিকে খারেজিদের ব্যাপারে বর্ণিত বিভিন্ন বর্ণনা দ্বারা প্রতীয়মান হয়—তাদের সকলেই নিহত হয়।[৭১] তবে মাসউদির অভিমত, খুবই নগণ্যসংখ্যক লোক; যাদের পরিমাণ ১০-এর চেয়ে কম—বেঁচে যেতে সক্ষম হয়। করুণ অপদস্থতার মুখে তারা পলায়ন করতে বাধ্য হয়।[৭২]

চার. স্তনের বোটার ন্যায় মাংসপেশী ও বেঁটে হাতবিশিষ্ট লোক! তার হত্যায় আলি রা.-এর বাহিনীতে প্রভাব

স্তনের বোটার ন্যায় মাংসপেশীবিশিষ্ট লোকটি কে ছিল? তার ব্যক্তিত্বের নির্ধারণে বিভিন্ন বর্ণনা রয়েছে। তন্মধ্যে কিছু বর্ণনার সনদ দুর্বল, কিছু বর্ণনার সনদ শক্তিশালী। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদিসে স্তনের বোটার ন্যায় মাংসপেশীবিশিষ্ট লোকের কয়েকটি আকৃতির কথা এসেছে। যেমন, সে ছিল কালো চেহারাবিশিষ্ট।[৭৩]

আরেক বর্ণনামতে, সে ছিল হাবশি। হাত বেঁটে। খুবই ক্ষুদ্রাকৃতির; যেন কাঁধ হাতে বাহু পর্যন্ত তার দৈর্ঘ্য। অথবা কনুইয়ের নিচে হাতের আর অংশ

---

[৬৭] *আনসাবুল আশরাফ* : ২/৬৩ [সনদে একজন অজ্ঞাত রাবি রয়েছেন]।

[৬৮] *সহিহ মুসলিম* : ২/৭৪৮।

[৬৯] *মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবাহ* : ৫/৩১১; *তারিখে খলিফা* : ১৯৭ [সনদ হাসান]।

[৭০] *আল মারিফাতু ওয়াত তারিখ* : ৩/৩১৫; *তারিখে বাগদাদ* ১/১৮২।

[৭১] *আল কামিল- আখবারুল খাওয়ারিজ* ৩৩৮।

[৭২] *তারিখে খলিফা* : ১৯৮; *খিলাফাতু আলি* : ৩২৯।

[৭৩] *মুসান্নাফে আবদির রাজ্জাক* : ১০/১৪৬।

ছিল না এবং বাহুর ডগা; অর্থাৎ, শেষ অংশ স্তনের বোঁটার মতো। তার ওপর ছিল সাদা পশম। বাহুও তেমনই ঢিলেঢালা, থলথলে ও গোশতে ভরা; যেন সেখানে হাড্ডির লেশমাত্র নেই। তার কোনো স্থিরতা ছিল না। এদিক-ওদিক হেলেদুলে থাকত। হাতের ব্যাপারে যে তিনটি শব্দ এসেছে, সবগুলোর অর্থ বেঁটে হাতবিশিষ্ট।[৭৪]

উপরোক্ত আকৃতিবিশিষ্ট লোকটির নাম কী? এ ব্যাপারে যারা হারকুস (সোয়াদ দ্বারা) ইবনে জুহাইর আস সাদির কথা বলেছে, তাদের ধারণা ভুল।[৭৫] কারণ, হারকুস ছিল একজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি। ইসলামি বিজয়-অভিযানে তার কৃতিত্ব রয়েছে। সে উসমান রা.-এর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে অংশ নেয়। জামালে সুগরা অভিযানের পর যেখানে জুবাইর ও তালহা রা. বসরায় উসমান হত্যাকারীদের হত্যা করেছিলেন, এই লোক তখন ময়দান ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছিল। পরবর্তী সময়ে এই হারকুসই খারেজিদের গুটিকয়েক নেতাদের একজন হিসেবে গণ্য হয়।[৭৬] হ্যাঁ, এটুকু বলা যেতে পারে যে, এক বর্ণনায় তার নাম এসেছে হারকুস (সিন দ্বারা)। তার জন্ম সম্পর্কে তেমন কোনো তথ্য জানা যায় না। এক বর্ণনায় তার পিতৃত্বের পরিচয় এসেছে 'মালেক'। তার বিবরণ হচ্ছে, আলি রা.-এর নির্দেশে লড়াই সমাপ্তির পর তাকে সন্ধান করে আলি রা.-এর কাছে নিয়ে আসা হয়। তখন তিনি বলেছেন, 'আল্লাহু আকবার! তোমাদের মধ্যে কেউ কি তার পিতার নাম বলতে পারো?' লোকজন বলতে লাগল, 'তার নাম "মালেক"।' আলি রা. জিজ্ঞেস করলেন, 'সে কার ছেলে?' কেউ তার পিতার নাম বলতে পারল না।[৭৭]

ইতিহাসবিদ তাবারি রাহ. বিশুদ্ধ সূত্রে একটি বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন। তিনি লিখেছেন, স্তনের বোটার মতো মাংসপেশীবিশিষ্ট লোকটির নাম নাফে। অনুরূপ বর্ণনা *মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবাহ* ও *সুনানে আবি দাউদেও*

---

[৭৪] *আননিহায়া ফি গারিবিল হাদিস* : ১/১২, ১৩; *ফাতহুল বারি* : ১২/২৯৪, ২৯৫।

[৭৫] *আল মিলাল ওয়ান নিহাল* : ১/১১৫।

[৭৬] *ফাতহুল বারি* : ১২/২৯২; *আল ইসাবাহ* : ১৫/১৩৯।

[৭৭] *আল ফাতহুর রাব্বানি আলা মুসনাদিল ইমাম আহমাদ* : ২৩/১১৫ [সনদ হাসান]; *আল বিদায়া ওয়াননিহায়া* : ৭/২৯৪, ২৯৫।

এসেছে। কিন্তু উভয়টির সনদ অভিন্ন। সুতরাং তিনটি উৎসে একই বর্ণনা একই সনদে পাওয়া যাচ্ছে।[৭৮]

হজরত আলি রা. খারেজিদের ভ্রষ্ট চিন্তাধারার সূচনাতেই তাদের ব্যাপারে আলোচনা করেছিলেন। অধিকাংশ আলোচনায় তিনি স্তনের বোটার মতো মাংসপেশীবিশিষ্ট লোকের কথা উল্লেখ করতেন। এভাবে চূড়ান্ত লড়াই শেষে তিনি বেঁটে হাতবিশিষ্ট লোকটির সন্ধান করতে তাঁর সঙ্গীদের নির্দেশ দেন। কেননা, প্রতিপক্ষের মাঝে তার অস্তিত্বই আমাদের সততা ও সঠিকতার প্রমাণ। অনেক অনুসন্ধানের পর সেই লাশটি নাহরাওয়ান নদীর তীরে অন্যান্য লাশের সাথে পাওয়া যায়। লাশগুলো একটি আরেকটির উপর পড়ে ছিল। আলি রা. বললেন, 'এগুলো পৃথক করো'। দেখা গেল সবার নিচে মাটির সাথে সেই বেঁটে হাতবিশিষ্ট লোকটির লাশ পড়ে আছে। তিনি 'আল্লাহু আকবার' বলে উঠলেন। বললেন, 'আল্লাহ তাআলা সত্য বলেছেন এবং তাঁর রাসুল তাবলিগের হক আদায় করেছেন।' অতঃপর তিনি শুকরিয়াস্বরূপ সেজদা আদায় করেন। তাঁকে দেখে অন্যরাও শুকরিয়ার সেজদা আদায় করেন। খুশির রেখা ফুটে ওঠে সকলের চেহারায়।[৭৯]

পাঁচ. খারেজিদের সাথে আমিরুল মুমিনিন আলি রা.-এর আচরণ

আমিরুল মুমিনিন হজরত আলি রা. যুদ্ধের পূর্বে ও পরে খারেজিদের সাথে মুসলমানদের মতো আচরণ করেন। যুদ্ধ শেষ হওয়ার সাথে সাথে তিনি তার বাহিনীর মাঝে ঘোষণা দেন—'পলাতক কাউকে ধাওয়া করবে না। আহত কাউকে হত্যা করবে না। বিকৃত করবে না কারও চেহারা।'

আবু ওয়ায়েল নামে খ্যাত বিশিষ্ট ফকিহ তাবেয়ি শাকিক বিন সালামাহ হজরত আলি রা.-এর সাথে সবক'টি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তিনি বলেন, আলি রা. জঙ্গে জামাল ও নাহরাওয়ান যুদ্ধের সময় কাউকে গালি দেননি।[৮০] তিনি নাহরাওয়ান ছেড়ে আসা প্রতিপক্ষের মাঝে সাধারণ ঘোষণা দেন—'যে তার সামানপত্র চিনতে পারে, সে যেন তা নিয়ে নেয়।' লোকেরা

---

[৭৮] আবদুল হামিদ প্রণীত *খিলাফাতে আলি ইবনে আবি তালিব* : ৩৩৪।

[৭৯] *মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবাহ* : ৫/৩১৭, ৩১৯ [সনদ বিশুদ্ধ]।

[৮০] বায়হাকি প্রণীত *আসসুনানুল কুবরা* : ৮/১৮২।

এসে নিজ সামানপত্র নিয়ে যায়। শেষে একটি পাতিল অবশিষ্ট থাকে। সেটাও এক ব্যক্তি এসে নিয়ে যায়। এই বর্ণনা বিভিন্ন সনদে বিবৃত আছে।[৮১]

আলি রা. খারেজিদের যুদ্ধ-উপকরণ ছাড়া অন্য কোনো সম্পদ তাঁর বাহিনীর লোকদের মাঝে গনিমত তথা যুদ্ধলব্ধ সম্পদ হিসেবে বণ্টন করেননি। তিনি খারেজিদের কাফের বলেননি। কেননা, যুদ্ধ শুরুর প্রাক্কালে তিনি তাদেরকে মুসলিম জামাতে ফিরিয়ে আনতে প্রাণপণ চেষ্টা করেছেন। তাদের বহুভাবে বুঝিয়েছেন। সতর্ক করেছেন যুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতি সম্পর্কে। ফলে বহু লোক ফিরে আসে। আল্লামা ইবনে কুদামা বলেন, 'তিনি এই পন্থা অবলম্বনের কারণ হচ্ছে, তাদের ভ্রষ্ট চিন্তাধারা দূরীভূত করা; হত্যা নয়। তারা তা মেনে নিলে সেটা হতো যুদ্ধের চেয়ে উত্তম উদ্যোগ। কেননা, যুদ্ধে ক্ষয়ক্ষতি হয়ে থাকে উভয় পক্ষেরই। অতএব, তাঁর এই দৃষ্টিভঙ্গি প্রমাণ করে খারেজিরা মুসলমানদের একটি ফেরকা। বহু আলেম এই অভিমত পোষণ করেছেন।'[৮২]

অবশ্য সাআদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রা. তাদের ফাসেক হিসেবে অভিহিত করেছেন। মুসআব ইবনে সাআদ বলেন, আমি আমার আব্বাকে নিম্নের আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম,

﴿قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا * الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا﴾

> 'বলুন, আমি কি তোমাদেরকে সেসব লোকের সংবাদ দেবো, যারা কর্মের দিক দিয়ে খুবই ক্ষতিগ্রস্ত। তারাই সে লোক, যাদের প্রচেষ্টা পার্থিবজীবনে বিভ্রান্ত হয়; অথচ তারা মনে করে তারা সৎকর্ম করেছে।' *-সুরা কাহাফ : আয়াত ১০৩, ১০৪।*

এই আয়াত দ্বারা কি 'হারুরি' লোকজন উদ্দেশ্য? তিনি বললেন, 'না; বরং এর দ্বারা আহলে কিতাব তথা ইহুদি-খ্রিষ্টান উদ্দেশ্য। ইহুদিরা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে। আর খ্রিষ্টানরা

---

[৮১] আততালখিসুল হাবির : ৪/৪৭।
[৮২] ফাতহুল বারি : ১২/৩০০, ৩০১; নাইলুল আওতার : ৮/১৮২।

জান্নাত অস্বীকার করে বলেছে, সেখানে পানাহার-সামগ্রী নেই।' তবে 'হারুরি' লোকদের আলোচনা এসেছে নিম্নের আয়াতে—

﴿وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلاَّ الْفَاسِقِينَ * الَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الأَرْضِ أُولَـئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ﴾

'তিনি অনুরূপ উপমা দ্বারা অসৎ ব্যক্তিবর্গ ছাড়া কাউকে বিপথগামী করেন না। (বিপথগামী ওরাই) যারা আল্লাহর সঙ্গে অঙ্গীকারাবদ্ধ হওয়ার পর তা ভঙ্গ করে এবং আল্লাহ তাআলা যা অবিচ্ছিন্ন রাখতে নির্দেশ দিয়েছেন, তা ছিন্ন করে, আর পৃথিবীর বুকে অশান্তি সৃষ্টি করে। ওরা যথার্থই ক্ষতিগ্রস্ত।' *-সুরা বাকারা : আয়াত ২৬, ২৭।*

যাইহোক, হজরত সাআদ রা. তাদেরকে ফাসেক হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।[৮৩] সাআদ রা. সম্পর্কে আরও একটি বর্ণনা এমন আছে—যখন তাঁকে ওদের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হয়; তখন তিনি বলেন, 'ওরা এমন জাতি, যারা হবে বক্র প্রকৃতির। সুতরাং আল্লাহ তাআলা তাদের অন্তরে বক্রতা সৃষ্টি করে দিয়েছেন।'[৮৪]

হজরত আলি রা.-কে জিজ্ঞেস করা হলো, 'ওইসব লোক কি কাফের?' তিনি বললেন, 'তারা কুফরির অভিযোগ এনে সঙ্গ ত্যাগ করেছে।' অতঃপর জিজ্ঞেস করা হলো, 'তারা কি মুনাফিক?' তিনি বললেন, 'মুনাফিকরা তো আল্লাহর জিকর খুব কম করে থাকে।' পরে তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো, 'তাহলে তারা কারা?' জবাবে তিনি বললেন, 'ওরা এমন জাতি, যারা আমাদের সাথে বিদ্রোহ করেছে এবং আমরা তাদের হত্যা করেছি।'

অন্য বর্ণনায় জবাবটি এসেছে এভাবে—তারা এমন জাতি, যারা আমাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে। আমাদেরকে তাদের বিরুদ্ধে সাহায্য করা হয়েছে।

---

[৮৩] *সহিহ বুখারি ফাতহুল বারিসহ : ৫/৮৪২।*

[৮৪] *মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবাহ : ১৫/৩২৪, ৩২৫; শাতিবি প্রণীত আল ইতিসাম : ১/৬২।*

তৃতীয় বর্ণনামতে—তারা এমন এক জাতি, যারা ফিতনায় পতিত হয়েছে; ফলে তারা অন্ধ ও বধিরের মতো রয়ে গেছে।[৮৫]

অনুরূপভাবে তিনি তাঁর বাহিনী এবং গোটা মুসলিম জাতিকে নসিহত করতে গিয়ে বলেন, 'বিদ্রোহীরা যদি ন্যায়নিষ্ঠ ইমামের বিরোধিতা করে, তাহলে তাদের হত্যা করো। যদি জালেম ইমামের বিরোধিতা করে, তাহলে তাদের হত্যা করো না। কেননা, তাদের মতপ্রকাশের স্বাধীনতা আছে।'[৮৬]

আমিরুল মুমিনিন হজরত আলি রা.-এর খারেজিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ এবং উষ্ট্রীর ও সিফফিনে মুসলমানদের সাথে যুদ্ধের মাঝে যথেষ্ট পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। উষ্ট্রী ও সিফফিন যুদ্ধের কারণে তিনি বেশ অনুতপ্ত ছিলেন। লজ্জায় অশ্রু ঝরিয়েছেন। কিন্তু খারেজিদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে তিনি বেশ শান্তি পান।

ইমাম ইবনে তাইমিয়া রাহ. বলেন, শরয়ি ভাষ্য ও ইজমা উভয়ের মাঝে পার্থক্য নির্ণয় করে দিয়েছে। তিনি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্পষ্ট ভাষ্যের আলোকে খারেজিদের হত্যা করেছেন। এতে তিনি তৃপ্ত ও সন্তুষ্ট ছিলেন। সাহাবাদের মধ্যে কেউই এক্ষেত্রে তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করেননি। অন্যদিকে সিফফিনের যুদ্ধের ব্যাপারে তিনি নিজেই অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন এবং অনুতাপে দগ্ধ হয়েছেন।[৮৭]

---

[৮৫] মুসান্নাফে আবদির রাজ্জাক : ১০/১৫০; মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবাহ : ১৫/৩২২ [সনদ বিশুদ্ধ]।
[৮৬] মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবাহ : ১৫/৩২০; ফাতহুল বারি : ১২/৩০১।
[৮৭] মাজমুউল ফাতাওয়া : ২৮/৫১৬।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

আলি রা.-এর যুদ্ধের মাধ্যমে প্রাপ্ত ফেকহি মাসায়িল

আমিরুল মুমিনিন হজরত আলি রা.-এর জ্ঞানের গভীরতা ও ফেকহি বুৎপত্তি এতো উঁচু পর্যায়ের ছিল যে, তিনি সার্বিক পরিস্থিতি ও বাস্তবতার আলোকে শরয়ি মূলনীতি ও বিধানাবলি প্রণয়ন ও চয়ন করতে পারতেন। এরই প্রেক্ষিতে তিনি মুসলমানদের ইমামের সাথে বিদ্রোহকারীদের হত্যার ব্যাপারে শরয়ি মূলনীতি উদ্ভাবন করেন। পরবর্তী সময়কার সুন্নাহ ও ফিকহের ইমামগণ বিদ্রোহীদের ব্যাপারে তাঁর পদক্ষেপ ও দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা ব্যাপক উপকৃত হন। তারা এ-সংক্রান্ত বিস্তারিত ফেকহি মূলনীতি ও বিধান উদ্ভাবন ও বিন্যস্ত করেন। একপর্যায়ে অধিকাংশ ওলামায়ে কেরাম একথা বলতে বাধ্য হয়েছেন যে, প্রতিপক্ষের সাথে যদি আলি রা.-এর যুদ্ধ না হতো, তাহলে আহলে কিবলা (মুসলমান)-দের সাথে যুদ্ধের ব্যাপারে শরয়ি বিধান অজানা থেকে যেত।[৮৮] একথা স্বয়ং আলি রা. হতেও বর্ণিত আছে। তিনি বলতেন, 'আপনাদের কী মনে হয়, আমি যদি মানুষের দৃষ্টি থেকে আড়ালে থাকতাম তাহলে আজ এদের সাথে এমন কাজ কে আদায় করত?'[৮৯]

আহনাফ যখন আলি রা.-কে জিজ্ঞেস করলেন, 'হে আলি, বসরায় আমাদের স্বজাতিরা ভাবছে; আপনি যদি আগামীতে তাদের ওপর বিজয়ী হন, তবে তাদের পুরুষদের হত্যা করে ফেলবেন এবং নারীদের বন্দি বানাবেন।' আলি রা. তখন বললেন, 'আমার মতো মানুষের দ্বারা এ কাজ কখনো হবে না। কাফের ও মুরতাদ ছাড়া অন্য কারও বিরুদ্ধে কি এমনটি করা বৈধ?'

যাইহোক, তাঁর উপরোক্ত উক্তি ও দৃষ্টিভঙ্গির প্রেক্ষিতে বলা যায়, কাফের-মুরতাদদের স্থলে আহলে কিবলার বিরুদ্ধে যুদ্ধের মাঝে কয়েক ধরনের পার্থক্য রয়েছে। যার বিবরণ নিম্নরূপ :

১. বিদ্রোহী মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের উদ্দেশ্য হচ্ছে কেবল তাদের ভয় দেখানো; প্রাণে মেরে ফেলা নয়। কেননা, তাদের হত্যা করা মূল

---

৮৮ আল বাকিল্লানি প্রণীত আততামহিদ : ২৯৯; তাহকিকু মাওয়াকিফিস সাহাবাহ : ২/২৯৫।
৮৯ মুসান্নাফে আবদির রাজ্জাক : ১০/১২৪।

সমাধান নয়; বরং আনুগত্যে ফিরিয়ে আনা এবং অন্যায়-অনাচার প্রতিহত করাই এর মূল লক্ষ্য।[৯০]

২. যদি বিদ্রোহীদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে তাদের গোলাম, শিশু ও নারীরাও লড়াইয়ে অংশ নেয়, তখন সবার জন্য প্রাপ্তবয়স্ক স্বাধীন পুরুষের বিধান আরোপিত হবে। তারা আক্রমণে উদ্ধত হলে হত্যা করা হবে। পলায়নের ক্ষেত্রে ছেড়ে দেওয়া হবে। কারণ, তাদের সাথে লড়াইয়ের উদ্দেশ্য হচ্ছে তাদের অনিষ্ট হতে অন্যদের মুক্তি দেওয়া। পক্ষান্তরে মুরতাদ ও কাফেরদের বিরুদ্ধে লড়াইকালে আক্রমণ ও পশ্চাৎপসারণ—উভয় ক্ষেত্রেই তাদের হত্যা করা যাবে।[৯১]

৩. বিদ্রোহীরা কোনো কারণে যদি লড়াই থামিয়ে দেয়; চাই আনুগত্য স্বীকারের মাধ্যমে বা অস্ত্র রেখে দেওয়ার মাধ্যমে, পরাজয় বরণের ফলে, আহত হওয়ায়, কোনোরূপ ব্যাধির কারণে কিংবা বন্দি হবার ভয়ে—সর্বাবস্থায় তাদের আহতদের আক্রমণ করা এবং বন্দিদের হত্যা করা বৈধ নয়। পক্ষান্তরে মুশরিক ও মুরতাদদের কেউ আহত হলে তাকে আক্রমণ এবং বন্দিদের হত্যা বৈধ।

মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবাহ গ্রন্থে আলি রা.-এর বর্ণনা এসেছে; তিনি উষ্ট্রীর যুদ্ধের দিন বলেছেন, 'পলাতক কারও পিছু ধাওয়া করবে না। আহত কাউকে আক্রমণ করবে না। যে অস্ত্র ফেলে দেবে সে নিরাপত্তা পাবে।'[৯২]

আবদুর রাজ্জাক-এর বর্ণনায় এসেছে; আলি রা. তাঁর ঘোষককে ঘোষণা দিতে বলেন। সে বসরার দিন ঘোষণা দেয়, 'পলাতক কাউকে পিছু ধাওয়া করবে না। আহত কাউকে হত্যার উদ্দেশ্যে আক্রমণ করবে না। কোনো বন্দিকে হত্যা করবে না। যে ব্যক্তি তার ঘরের দরজা বন্ধ রাখবে বা অস্ত্র ফেলে দেবে, সে নিরাপদে থাকবে।' আলি রা. তাদের ফেলে যাওয়া সম্পদ হতে কিছুই গ্রহণ করেননি।[৯৩]

উষ্ট্রীর যুদ্ধের দিন তিনি ঘোষণা দিয়েছেন, 'পলাতক কাউকে পিছু ধাওয়া করবে না। আহত কাউকে হত্যার উদ্দেশ্যে আক্রমণ করবে না। কোনো

---

[৯০] আল মুগনি : ৮/১০৮, ১২৬।
[৯১] আল মুগনি : ৮/১১০; আল আহকামুস সুলতানিয়া : ৬০।
[৯২] মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবাহ : ১০/২৩৬; ফাতহুল বারি : ১৩/৫৭ [সনদ বিশুদ্ধ]।
[৯৩] মুসান্নাফে আবদির রাজ্জাক : ১০/১২৩, ১২৪; তাহকিকু মাওয়াকিফিস সাহাবাহ : ২/২৯৬।

বন্দিকে হত্যা করবে না। মহিলাদের দিকে তাকাবে না; যদিও সে তোমাদের মন্দ বলে এবং তোমাদের নেতাদের গালমন্দ করে। জাহেলি যুদ্ধের সংস্কৃতি সম্পর্কে আমার ধারণা আছে। তাদের পুরুষেরা কোনো মহিলাকে লাঠি বা ডাণ্ডা দিয়ে পেটালে, সেই মহিলা এবং তার সন্তানকে সমাজে হেয় প্রতিপন্ন করা হতো।'[৯৪]

আবু উমাম বাহিলি বলেন, আমি সিফফিন যুদ্ধে উপস্থিত ছিলাম। ওরা (আলি রা.-এর সঙ্গীরা) আহত কাউকে আক্রমণ করত না। পলাতক কাউকে হত্যা করত না। নিহত কাউকে ফাঁসি দিত না।[৯৫]

৪. বন্দি অবস্থায় বিদ্রোহী বন্দিকে বিদ্রোহী হিসেবে গণ্য করা হবে। তার ব্যাপারে যুদ্ধে অংশগ্রহণ না-করার নিশ্চয়তা থাকলে তাকে ছেড়ে দেওয়া হবে। আর কারও ব্যাপারে যদি নিশ্চিত হওয়া না যায়, তবে যুদ্ধের শেষ পর্যন্ত তাকে বন্দি করে রাখা হবে, অতঃপর তাকে মুক্ত করে দেওয়া হবে। পরবর্তী সময়ে তাকে আর বন্দি করে রাখার প্রয়োজন নেই। পক্ষান্তরে কাফের বন্দিকে পরেও কয়েদখানায় রাখা হবে।[৯৬]

৫. বিদ্রোহীদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য কোনো মুশরিকের কাছ থেকে সাহায্য নেওয়া যাবে না, চাই সেই মুশরিক জিম্মি হোক বা চুক্তিবদ্ধ। পক্ষান্তরে মুরতাদ-কাফেরদের বিরুদ্ধে লড়াইকালে তাদের সাহায্য নেওয়া যাবে।[৯৭]

৬. তাদের সাথে সাময়িক কোনো সন্ধি করা যাবে না। সম্পদের বিনিময়ে যুদ্ধ বন্ধ রাখার ঘোষণাও দেওয়া যাবে না। তৎসময়কার ইমাম যদি সাময়িক সন্ধি করে নেয়, তবে তা গ্রহণযোগ্য হবে না। যথাসময়ে মোকাবিলা করতে অক্ষম হলে শক্তি সঞ্চয় করে পরে মোকাবিলা করতে হবে। সম্পদের বিনিময়ে যুদ্ধ বন্ধের সন্ধি করলে এই সন্ধি অগ্রহণযোগ্য হিসেবে বিবেচিত হবে। সম্পদের দিকে লক্ষ রাখতে হবে; সেগুলো যদি সদকা বা ফাইয়ের অংশ হয়, তবে তা ফেরত

---

[৯৪] *নাসবুর রায়াহ : ৩/৪৬৩।*
[৯৫] *আল মুসতাদরাক : ২/১৫৫* [সনদ হাসান। জাহাবি রাহ. সহমত ব্যক্ত করেছেন]।
[৯৬] *আল আহকামুস সুলতানিয়া : ৬০।*
[৯৭] *আল আহকামুস সুলতানিয়া : ৬০।*

দেওয়া যাবে না; বরং সদকাগুলো সদকা গ্রহণকারীদের মাঝে বিতরণ করে দিতে হবে এবং ফাইয়ের সম্পদ তার অধিকারীর মাঝে বণ্টন করে দিতে হবে। যদি সেই সম্পদ কেবল তাদের নিজ উপার্জনেরই হয়, তাহলে ইমাম তাতে হস্তক্ষেপ করতে পারবেন না; বরং সেগুলো তাদেরকে ফেরত দিতে হবে।[৯৮] কেননা, আলি রা. উষ্ট্রীর যুদ্ধে অংশ নেওয়া লোকদের সম্পদ নিজের জন্য বৈধ মনে করেননি।

৭. বিদ্রোহীরা যদি যুক্তিযুক্ত কোনো কারণে ইমামের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে, তবে ইমামকে তাদের সাথে পত্রের আদান-প্রদান করতে হবে। যদি তারা নিজেদের ওপর কোনো জুলুমের বিষয় দেখিয়ে দেয়, তবে ইমামের উচিত তা দূর করা। কোনো সন্দেহ করে থাকলে তা স্পষ্টকরণ ও নিরসনও তাঁর কর্তব্য। যেমন, আলি রা. খারেজিদের সন্দেহ দূর করেছেন। ফলে বহুসংখ্যক খারেজি মুসলিম জামাতে ফিরে আসে।[৯৯] সুতরাং সন্দেহ নিরসনের পর তারা ফিরে এলে তো ভালো, অন্যথায় তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা ইমাম এবং মুসলমানদের ওপর ওয়াজিব।[১০০]

৮. বাহ্যত যদি বিদ্রোহীরা ইমামের আনুগত্য করে থাকে, পৃথক হয়ে কোথাও সমবেত হয়ে না থাকে এবং তাদেরকে গ্রেফতার করা সহজ হয়; সেক্ষেত্রে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা যাবে না। বরং গ্রেফতার করে তাদেরকে বিচারালয়ে সোপর্দ করতে হবে। বিচারক যথাযথ ফয়সালা দেবেন। তবে সে যাবতীয় শরয়ি ও মানবিক অধিকারপ্রাপ্ত হবে।[১০১]

৯. বিদ্রোহীদের সাথে এমন ধরনের যুদ্ধ বৈধ নয়, যা দ্বারা সাধারণ লোকদের জান-মালের হানি ঘটে। যেমন : তাদের বসতিতে আগুন লাগিয়ে দেওয়া, কামান দ্বারা গুলিবর্ষণ করা, বৃক্ষ ও বাসস্থান পুড়িয়ে ফেলা ও ধ্বংস করা। পক্ষান্তরে কাফের-মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধকালে এসব বৈধ। কেননা, দারুল ইসলামে এসব নিষিদ্ধ; চাই গুটিকয়েক লোকই হোক না কেন। অবশ্য যদি এর বিকল্প না থাকে; যেমন : বিদ্রোহীদের দুর্গে অবস্থান নেওয়া এবং অস্ত্র ফেলে না দেওয়া ইত্যাদি;

---

[৯৮] আল আহকামুস সুলতানিয়া : ৬০; তাহকিকু মাওয়াকিফিস সাহাবাহ : ২/২৯৮।
[৯৯] বায়হাকি প্রণীত আসসুনানুল কুবরা : ৮/১৮০।
[১০০] মাজমুউল ফাতাওয়া : ৪/৪৫০।
[১০১] আল আহকামুস সুলতানিয়া : ৫৮।

সেক্ষেত্রে ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম শাফেয়ি রাহ.-এর মতানুসারে তাদের ওপর কামানের গোলাবর্ষণ ও অগ্নিসংযোগ বৈধ।[১০২]

১০. বিদ্রোহীদের সম্পদ যুদ্ধলব্ধ সম্পদ হিসেবে ব্যবহার করা এবং তাদের সন্তানদের বন্দি করা বৈধ নয়। কেননা, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'কোনো মুসলমানের সম্পদ তার অনিচ্ছায় গ্রহণ করা বৈধ নয়।'[১০৩]

আলি রা.-এর ব্যাপারে বর্ণিত আছে, তিনি উষ্ট্রীর যুদ্ধের দিন বলেছেন, 'যে ব্যক্তি নিজের কোনো সম্পদ আমাদের লোকদের কাছে পাবে, সে যেন তা নিয়ে নেয়।'[১০৪]

পরবর্তী সময়ে তাঁর এই দৃষ্টিভঙ্গি খারেজিদের জন্য আপত্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তারা বলে, 'আলি মুআবিয়া ও তার সাথিদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছে; অথচ তাদের গালমন্দ করেনি। তাদের সম্পদ যুদ্ধলব্ধ সম্পদ হিসেবে গ্রহণ করেনি। তাদের রক্ত যদি বৈধ হয়ে থাকে, তবে তাদের সম্পদ বৈধ হবে না কেন? সম্পদ হারাম হয়ে থাকলে রক্তও হারাম। সেক্ষেত্রে তাদের বিরুদ্ধে কেন যুদ্ধ করা হলো?'

ইবনে আব্বাস রা. তাদের সাথে মুনাজারা করার সময় এই অভিযোগের জবাব দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, 'তোমরা কি স্বীয় মা; অর্থাৎ, আয়েশা রা.-কে গালমন্দ করা পছন্দ করবে? তাঁদের কাছ থেকে যা গ্রহণ করা তোমরা বৈধ মনে করো, তাঁর কাছ থেকেও কি তা গ্রহণ করা বৈধ মনে করবে? আর যদি তোমরা বলো যে, তিনি আমাদের "মা" নন, তাহলে তো তোমরা কুফরি করে বসলে। আর যদি তাকে "মা" হিসেবে মেনে থাকো, তবে কি তাঁকে "বাঁদি" বানাতে চাও? এটাও তো কুফরি।'[১০৫]

আল্লামা ইবনে কুদামা রাহ. এই ঘটনার আলোকে লিখেন, বিদ্রোহীদের সাথে যুদ্ধের লক্ষ্য হচ্ছে তাদের নিরুৎসাহিত করা এবং হকের দিকে ডেকে আনা। কুফরির ভিত্তিতে তাদের সাথে যুদ্ধ করা হচ্ছে না। অতএব, তাদের জান,

---

[১০২] ইবনে কুদামা প্রণীত আল মুগনি : ৮/১১০।
[১০৩] সুনানে দারাকুতনি : ৩/২৬।
[১০৪] আল মুগনি : ৮/১১৫।
[১০৫] বায়হাকি প্রণীত আসসুনানুল কুবরা : ৮/১৭৯; নাসায়ি প্রণীত খাসায়িসু আমিরিল মুমিনিন : ১৯৭ [সনদ হাসান]।

মাল, ইজ্জত-আব্রুর ওপর ওই পরিমাণ হস্তক্ষেপ করা যাবে, যা দ্বারা তারা পিছু সরে আসে। যেমনটি হামলাকারী ও ডাকাতদের বেলায় করা হয়ে থাকে। তাদের সম্পদ ও সন্তান নিজ নিজ স্থানে বহাল থাকবে। অর্থাৎ, তাতে হস্তক্ষেপ হারাম হিসেবে বিবেচিত হবে।[১০৬]

অবশ্য আলি রা.-এর দৃষ্টিভঙ্গির দিকে তাকিয়ে এটুকু বলা যেতে পারে যে, তাদের অস্ত্র ব্যবহার করা যাবে। যেমন ইবনে আবি শাইবাহ আবুল বুখতারি হতে বর্ণনা করেছেন, উষ্ট্রীবাহিনী পরাজয় বরণ করলে আলি রা. বলেন, 'যারা বাহিনীর বাইরে অবস্থান করছে তাদের অনুসন্ধান করবে না। তাদের যেসব অস্ত্র ও সওয়ারি তোমরা পেয়েছ তা তোমাদের।'[১০৭]

আরেক বর্ণনায় আছে; তিনি বলেছেন, 'বাহিনীর অভ্যন্তরে পড়ে থাকা সম্পদ ব্যতীত অন্য কোনো সম্পদে কিছুতেই হস্তক্ষেপ করবে না।'[১০৮]

১১. নিহত বিদ্রোহীদের গোসল দিতে হবে। কাফন পরাতে হবে এবং জানাজার নামাজ পড়াতে হবে। কেননা, ইমাম শাফেয়ি রাহ. এবং আসহাবুর রায়-এর মতাদর্শমতে সে মুসলমান।[১০৯]

১২. বিদ্রোহী গোষ্ঠী যদি বেদআতি না হয়, তাহলে তাকে ফাসেক বলা যাবে না। মুসলমানদের ইমাম এবং বিচারকদের বিরুদ্ধে তার বিদ্রোহকে তার ইজতেহাদি ভুল হিসেবে সাব্যস্ত করা হবে। তাদের বিধান হবে মুজতাহিদ ফকিহদের অনুরূপ। তাদের মধ্যকার নীতিবান সদস্য সাক্ষ্য দিলে ইমাম শাফেয়ির ভাষ্য অনুসারে তার সাক্ষ্য ধর্তব্য হবে। কিন্তু যদি খারেজি ও বেদআতিরা ইমামের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে, সেক্ষেত্রে তাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না। কেননা, তারা ফাসেক।[১১০]

১৩. ন্যায়নিষ্ঠ ইমামের জন্য নিজের রক্ত-সম্পর্কীয় বিদ্রোহী আত্মীয়কে হত্যা করা বৈধ। কেননা, তিনি তাকে অন্যায়ভাবে হত্যা করছেন না। এই হত্যা তার ওপর হদ তথা শরয়ি শাস্তি আরোপের মতো। তবুও তাকে ক্ষমা করে দেওয়া উচিত।[১১১]

---

[১০৬] তাহকিকু মাওয়াকিফিস সাহাবাহ : ২/৩০০।
[১০৭] মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবাহ : ১৫/২৬৩।
[১০৮] তাহকিকু মাওয়াকিফিস সাহাবাহ : ২/৩০০।
[১০৯] তাহকিকু মাওয়াকিফিস সাহাবাহ : ২/৩০১।
[১১০] আল মুগনি : ৮/১১৮; তাহকিকু মাওয়াকিফিস সাহাবাহ : ২/৩০১।
[১১১] আল মুগনি : ৮/১১৮; তাহকিকু মাওয়াকিফিস সাহাবাহ : ২/৩০১।

১৪. কোনো শহরে বিদ্রোহীদের আধিপত্য দেখা দিলে এবং সেখানে যদি তারা নিজেদের ব্যবস্থাপনায় খারাজ, জাকাত ও জিজিয়া ইত্যাদি উসুলের পাশাপাশি শরয়ি শাস্তিও কার্যকর করে; পরবর্তী সময়ে অবস্থার পরিবর্তন ঘটলে হকপন্থীরা যদি সেখানে তাদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেন, তাহলে তারা অতীতে উসুলকৃত সম্পদের কিছুই গ্রহণ করতে পারবেন না। কেননা, উষ্ট্রীর যুদ্ধের পর বসরাবাসীর ওপর আলি রা.-এর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হলে তিনি অতীতে সেখানকার উসুলকৃত কোনো সম্পদ চাননি।[১১২]

১৫. **বিদ্রোহী ও হকপন্থীদের উত্তরাধিকারীর বিধান :** কোনো নিহত বিদ্রোহী কোনো হকপন্থীর উত্তরাধিকার হতে পারবেন না। তদ্রূপ নিহত কোনো হকপন্থীর উত্তরাধিকারও কোনো বিদ্রোহী হতে পারবে না।

কেননা, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'হত্যাকারী উত্তরাধিকার হতে পারবে না।'[১১৩] আবু হানিফা রাহ. বলেন, 'আমি হকপন্থীদেরকে বিদ্রোহীর উত্তরাধিকার বলতে পারি; কিন্তু কোনো বিদ্রোহীকে হকপন্থীদের উত্তরাধিকার বলতে পারি না।'

ইমাম আবু ইউসুফ রাহ. বলেন, 'আমি পরস্পর একে অন্যের উত্তরাধিকার বলি। কেননা, উভয়ের হত্যা তাদের ইজতেহাদি ভুলের ওপর নির্ভরশীল।'[১১৪] ইমাম নববি রাহ.-ও এই অভিমত পোষণ করেছেন।[১১৫]

১৬. বিদ্রোহীদের যদি হত্যা বিনে থামানো না যায়, সেক্ষেত্রে তাদের হত্যা করা হবে। হত্যাকারী এক্ষেত্রে গোনাহগার হবেন না। তার ওপর জামানত বা কাফফারা ওয়াজিব হবে না। কেননা, সে শরয়ি বিধানের আলোকে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে এবং আল্লাহকে সন্তুষ্টির লক্ষ্যে হত্যা করেছে।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

﴿فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ﴾

---

[১১২] আল মুগনি : ৮/১১৯; তাহকিকু মাওয়াকিফিস সাহাবাহ : ২/৩০২।
[১১৩] সুনানে ইবনে মাজাহ : ২/৮৮৩।
[১১৪] আল আহকামুস সুলতানিয়া : ৫৮।
[১১৫] শারহুন নববি আলা সহিহ মুসলিম : ৭/১১০।

‘তবে তোমরা আক্রমণকারী দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে; যে পর্যন্ত না তারা আল্লাহর নির্দেশের দিকে ফিরে আসে।’ *-সুরা হুজুরাত : আয়াত ৯।*

কোনো মুসলমানের ওপর যদি প্রাণসংহারক আক্রমণ করা হয়, তাহলে হত্যা ছাড়া বিকল্প পাওয়া না-যাবার শর্তে নিজের প্রতিরক্ষায় আক্রমণকারীকে হত্যা করা বৈধ।

অনুরূপভাবে যুদ্ধের সময় হকপন্থীরা বিদ্রোহীদের যেসব সম্পদ বিনষ্ট করেছে, তার জরিমানা বা ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না।[১১৬] তদ্রূপ ইমাম নববি রাহ.-এর বিশুদ্ধ ভাষ্যমতে, বিদ্রোহীরা যদি যুদ্ধের সময় হকপন্থীদের জান-মালের ক্ষতি সাধন করে, তারও কোনো ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না।[১১৭] এর প্রমাণ হচ্ছে সাহাবায়ে কেরামগণের ইজমা—যা জুহরির সনদে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, প্রথম ফিতনা দেখা দিলে সেসময় রাসুলের সাহাবিগণ বেঁচে ছিলেন। তন্মধ্যে বদরে অংশগ্রহণকারী সাহাবাও ছিলেন। তাঁরা সবাই এ ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করেছেন যে, কুরআনের ব্যাখ্যার ভিত্তিতে পরস্পর হত্যা ও রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের কারণে কারও কাছ থেকে কিসাস নেওয়া হবে না এবং কারও সম্পদ ছিনিয়ে নেওয়া যাবে না।[১১৮]

আবদুর রাজ্জাক-এর বর্ণনায় এসেছে, প্রথম ফিতনা দেখা দিলে সেসময় রাসুলের সাহাবিগণ বেঁচে ছিলেন। তন্মধ্যে বদরে অংশগ্রহণকারী সাহাবাও ছিলেন। তারা সবাই এ ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করেছেন যে, কুরআনের ব্যাখ্যার ভিত্তিতে কোনো মহিলাকে বন্দি করা এবং তার লজ্জাস্থান বৈধ-জ্ঞানকারীর ওপর শরয়ি শাস্তি পতিত হবে না। এ লক্ষ্যে কারও রক্ত বৈধ জ্ঞানকারীর কাছ থেকে কিসাস নেওয়া হবে না। একই উদ্দেশ্যে অন্যের সম্পদ বৈধকারীর কাছ থেকে সম্পদ ফিরিয়ে নেওয়া হবে না। হ্যাঁ, যদি এমন কোনো বস্তু থাকে যা তার মালিকের কাছে পরিচিত, তবে তা তার মালিককে ফেরত দিতে হবে।[১১৯]

---

[১১৬] *আল মুগনি* : ৮/১১৯

[১১৭] *শারহুন নববি আলা সহিহ মুসলিম* : ৭/১৭০।

[১১৮] বায়হাকি প্রণীত *আসসুনানুল কুবরা* : ৮/১৭৪-এর বিশুদ্ধ সূত্রে *তাহকিকু মাওয়াকিফিস সাহাবাহ* : ২/৩০২।

[১১৯] *মুসান্নাফে আবদির রাজ্জাক* : ১০/১২১।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

খারেজিদের গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শনাবলি

খারেজিদের ইতিহাস অধ্যয়নকারীরা এই সম্প্রদায়ের গুরুত্বপূর্ণ কিছু অভ্যাস ও নিদর্শন দেখতে পাবেন। সেগুলো নিম্নরূপ :

এক. ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি

এটা কেউ অস্বীকার করতে পারবে না যে, খারেজিরা খুবই ইবাদত-বন্দেগি করে থাকে। তারা তাদের উদ্ভবের সূচনাতেই দীনের ওপর পরিপূর্ণরূপে অবিচল থাকার ব্যাপারে অভিলাসী। ইসলামে নিষিদ্ধ যাবতীয় বিষয়াদি থেকে তারা বহু দূরে থাকে। ইসলামের দৃষ্টিতে ছোট-বড় কোনো অপরাধ তারা সহ্য করতে পারত না। দীনদারির ক্ষেত্রে তারা ছিল উপমারহিত। বিষয়টি স্পষ্টকরণে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিম্নোক্ত হাদিস অপেক্ষা অন্য কোনো দলিলের প্রয়োজন পড়ে না। তিনি বলেছেন,

يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ، لَيْسَ قِرَاءَتُكُمْ إِلَى قِرَاءَتِهِمْ بِشَيْءٍ، وَلَا صِيَامُكُمْ إِلَى صِيَامِهِمْ بِشَيْءٍ

'তারা কুরআন পড়বে। তাদের পড়ার তুলনায় তোমাদের পড়া এবং তাদের রোজার তুলনায় তোমাদের রোজা কিছুই না।'[১২০]

ইবনে আব্বাস রা. যেসময় খারেজিদের সাথে মুনাজারা করার জন্য যান, সেসময় তাদের দীনি অবস্থার বিবরণ দিতে গিয়ে তিনি বলেন, 'সেখানে আমি এমন লোকজনের দেখা পেলাম, যাদের থেকে অধিক ইবাদতকারী কাউকে দেখিনি। তাদের কপালে সেজদার আধিক্যের কারণে আঘাতের চিহ্ন পড়ে গিয়েছিল। তাদের হাত যেন উটের হাত। (মাটিতে সেজদা দেওয়ার

[১২০] *সহিহ মুসলিম, আজজাকাত, শারহুন নববি* : ৭/১৭১।

কারণে ধূলোয় ধুসরিত হয়ে পড়েছিল)। তাদের শরীরে ছিল অনুন্নত জামা। লুঙ্গিগুলো টাখনুর চেয়ে বহু উপরে উঠানো। রাত জেগে ইবাদতের ফলে তাদের চেহারা শুষ্ক হয়ে যায়।'[১২১]

জুনদুব আলইজদি বলেন, 'আমি যখন আলি রা.-এর সঙ্গে ছিলাম এবং খারেজিদের দিকে অগ্রসর হয়ে তাদের সেনাছাউনি পর্যন্ত পৌঁছলাম, তখন মৌমাছির গুঞ্জনের ন্যায় তাদের কুরআন তেলাওয়াতের আওয়াজ শুনতে পেলাম।'[১২২]

নিঃসন্দেহে তারা নামাজ, রোজা ও তেলাওয়াতে খুবই যত্নবান ছিল। কিন্তু এক্ষেত্রে তারা সীমা অতিক্রম করে অতিরঞ্জন ও চরমপন্থার শিকার হয়েছে। অতঃপর বুদ্ধিপূজা ও চরমপন্থী চিন্তাধারা তাদের টেনে নিয়ে গেছে ইসলামের মূলনীতি ও আকিদার বিরুদ্ধে। উদাহরণস্বরূপ, তারা কবিরা গোনাহে লিপ্ত ব্যক্তিকে কাফের বলতে আরম্ভ করল। এমন গোনাহগারদের ব্যাপারে কতেক খারেজি এতটাই চরমপন্থা অবলম্বন করল যে, তাকে মুশরিক-কাফের আখ্যায়িত করে চিরকালীন জাহান্নামি হিসেবে সাব্যস্ত করে দিলো।[১২৩] এতেই ক্ষান্ত হয়নি; বরং এই কড়াকড়ি ও বাড়াবাড়ির ফলে যারা তাদেরকে দীনের সীমা এবং দীনের মহৎ লক্ষ্যের পরিপন্থী বলে বিরুদ্ধাচরণ করছিল, সেসব মুসলমানদেরও তারা কাফের ঘোষণা করল; মুনাফিক বলল। এমনকি নিজেদের বিরুদ্ধাচরণকারীদের রক্তও বৈধ মনে করতে শুরু করল।[১২৪] তাদের একটি শাখা সম্প্রদায়ের নাম 'আজারিকা'। এরা নিজেদের বিরোধী লোকদের স্ত্রী-সন্তানদের হত্যা করাও বৈধ মনে করত।[১২৫]

নিঃসন্দেহে খারেজিরা নিজেদের অজ্ঞতা, কড়াকড়ি, বাড়াবাড়ি ও উগ্রচিন্তার কারণে ইসলামের অনিন্দ্যসুন্দর চেহারায় ক্ষত সৃষ্টি করেছে। সীমালঙ্ঘন করেছে অপব্যাখ্যা আর ইজতেহাদের ক্ষেত্রে। ফলে তাদের মাঝে আর অবশিষ্ট রইল না ইসলামের সৌম্য আকৃতির দ্যুতি ও আধ্যাত্মিকতা। তারা এমনসব চিন্তাধারা, অপব্যাখ্যা ও মতাদর্শ লালন করতে শুরু করল, যার

---

[১২১] *তালবিসু ইবলিস* : ৯১।
[১২২] *তালবিসু ইবলিস* : ৯৩।
[১২৩] ইবনে হাজাম প্রণীত *আল ফাসল* : ৪/১৯১; নাসির আস সাবি প্রণীত *আল খাওয়ারিজ* : ১৮৩।
[১২৪] নাসির আস সাবি প্রণীত *আল খাওয়ারিজ* : ১৮৩।
[১২৫] *তালবিসু ইবলিস* : ৯৫।

অনুমতি না মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দিয়েছেন, না দিয়েছে কুরআন।

তবে তাদের বাহ্যিক তাকওয়া ও পবিত্রতার বিষয়ে আলোকপাত করতে গেলে বলতে হয়—এসব লোক এমন তাকওয়া ও পবিত্রতা দ্বারা ধোঁকা খেয়েছে। আত্মপ্রবঞ্চনার শিকার হয়েছে। যার দ্যুতি কেবল লোক দেখানো অসার ব্যাখ্যাতেই সীমাবদ্ধ। তারা লালায়িত ছিল জান্নাত অর্জনে। এর তরে চেষ্টা-সাধনাও কম করেনি। কিন্তু তা ছিল এমন পন্থায় যা ধর্মে বাড়াবাড়ি, অতিরঞ্জন ও অননুমোদিত পথ। এ কারণেই তারা মধ্যমপন্থার সীমা থেকে বেরিয়ে গেছে।[১২৬]

অথচ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ধর্মে বাড়াবাড়ি করতে ও চরমপন্থা দেখাতে নিষেধ করেছেন। কেননা, এটা ইসলামের মধ্যমপন্থা ও প্রশস্ত দৃষ্টিভঙ্গির বিপরীত। তিনি সাবধান করে বলেছেন, 'ধর্মে মনগড়া চিন্তাধারা লালনকারী ধ্বংস ও ক্ষতির মুখে পড়বে।'

هلك المتنطعون

'দীনের ব্যাপারে নিজের পক্ষ থেকে কঠোরতা অবলম্বনকারীরা ধ্বংস হয়ে গেল। (অথবা ধ্বংস হোক।)'

এ কথা তিনি তিনবার বলেছেন।[১২৭]

সুতরাং এই হাদিস আমাদের সামনে খারেজিদের বিকৃত বিচিত্র চিন্তাধারা ও প্রান্তিক চেতনার বিষয়টি স্পষ্ট করে দেয়। পাশাপাশি তাদের সমচিন্তার লোকদের পরিচয়ও জানিয়ে যায়; যাদের কর্মকাণ্ড খারেজিদের মতো। যারা ইসলামের সঠিক ও সরল পথ ছেড়ে কঠোরতা ও চরমপন্থার আশ্রয় নিয়েছে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

انَّ الدِّينَ يُسْرٌ، وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلاَّ غَلَبَهُ، فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا

'নিশ্চয়ই দীন সহজ-সরল। দীন নিয়ে যে কড়াকড়ি করে দীন তার ওপর বিজয়ী হয়। কাজেই তোমরা মধ্যপন্থা অবলম্বন করো এবং (মধ্যপন্থার) নিকটবর্তী থাকো।'[১২৮]

---

১২৬ নাসির আস সাবি প্রণীত *আল খাওয়ারিজ* : ১৮৪।
১২৭ *সহিহ মুসলিম* : ১৬/২২০।

দুই. দীন সম্পর্কে অজ্ঞতা

খারেজিদের একটি বড় দুর্বলতা—তারা কিতাব ও সুন্নাহ সম্পর্কে অজ্ঞ। তাদের মন-মস্তিষ্ক বিকারগ্রস্ত ও চিন্তা-গবেষণাশূন্য। শরয়ি ভাষ্যকে যথাযথ স্থান থেকে সরিয়ে অপাত্রে সন্নিবেশন তাদের অভ্যাস। এরই প্রেক্ষিতে ইবনে উমর রা. তাদেরকে আল্লাহ তাআলার 'নিকৃষ্ট সৃষ্টি' হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। তিনি বলেছেন, 'তারা কাফেরদের সম্পর্কে অবতীর্ণ আয়াত মুমিনদের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেছে।'[১২৯]

তাঁর কাছে হারুরা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, 'এরা মুসলমানদের কাফের বলে থাকে। তাদের জান-মান বৈধ মনে করে। তাদের স্ত্রীদের ইদ্দতের সময় বিয়ে করে। বিবাহিত কোনো নারী তাদের কাছে এলে তাদের বিয়ে করা দোষের মনে করে না। আমার মতে, তারা সর্বাগ্রে হত্যার উপযোগী।'[১৩০]

ইসলামি শরিয়তে তাদের অজ্ঞতার নিদর্শন এরচে বড় আর কী হতে পারে যে, তারা 'তাহকিম' তথা সালিশি-ব্যবস্থাকে কুফরির মতো গোনাহ হিসেবে আখ্যায়িত করেছে! সুতরাং তাদের আকিদামতে, যারা সালিশি ব্যবস্থার পক্ষে কথা বলবে, তাদের জন্য প্রথমত নিজের কুফরির স্বীকারোক্তি দেওয়া ও পরে তওবা করা আবশ্যক।[১৩১]

আলি রা.-এর কাছে তারা এটাই চেয়েছে। তিনি যেন প্রথমে নিজের কুফরির কথা স্বীকার করেন এবং পরে তা থেকে তওবা করেন। এ প্রেক্ষিতে আলি রা., তার সঙ্গী-সাথি ও আনসার-মুহাজির সাহাবিদেরকে অভিযুক্ত অপরাধী সাব্যস্ত করা এবং নিজেদের উত্তম ও নিরপরাধ মনে করা তাদের ভ্রষ্টতা ও অজ্ঞতার জ্বলন্ত প্রমাণ।[১৩২]

তাদের নিকৃষ্টতম অজ্ঞতার আরেকটি দৃষ্টান্ত—তারা যখন আবদুল্লাহ ইবনে খাব্বাব ও তাঁর গর্ভবতী স্ত্রীর সাক্ষাৎ পায়, তখন তারা আবদুল্লাহ ইবনে খাব্বাবকে কিছু প্রশ্ন করে। আলি ও উসমান রা. সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি

---

[১২৮] *সহিহ বুখারি মাআল ফাতহ* : ১/৯৩।
[১২৯] মুহাম্মাদ আবদুল হাকিম প্রণীত *জাহিরাতুল গুলু ফিদ্দিন* : ১১৪।
[১৩০] *আল ইতিসাম* : ২/১৮৩, ১৮৪।
[১৩১] *মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবাহ* : ১৫/৩১২; *ইরওয়াউল গালিল* : ৮/১১৮, ১১৯।
[১৩২] আসসাবি প্রণীত *আল খাওয়ারিজ* : ১৮৬।

যাচাই করে। তিনি তাঁদের উভয়ের প্রশংসা করলেন। এই সত্য প্রকাশের শাস্তিস্বরূপ তাঁকে ধমক ও মৃত্যুর হুমকি দেওয়া হয়। শেষে তাঁকে নির্মমভাবে হত্যা করে দেয় এবং তাঁর গর্ভবতী স্ত্রীর পেট চিঁড়ে হত্যা করা হয়।[১৩৩]

একদিকে তাদের অজ্ঞতার এই নিদর্শন, অন্যদিকে জিম্মি লোকের শূকর হত্যা করাকে পাপ জ্ঞান করে। পরে শূকরের মালিককে খুঁজে বের করে তার কাছে ক্ষমা চেয়ে নেয়।[১৩৪]

তাদের এমন বোধ-বিবেচনাকে ধিক্কার জানানোর ভাষা নেই। কেমন তাদের বুদ্ধি-জ্ঞান! কোনো মুমিন-মুসলমানের কাছে কি মুসলমানের চেয়ে শূকরের মর্যাদা বেশি হতে পারে?[১৩৫] কিন্তু কী-ই-বা আর বলা যেতে পারে! এরা তো অজ্ঞতার দাস। আত্মপূজা আর লেলিয়ে দেওয়া শয়তান তাদের পিছু ছাড়েনি।

হাফেজ ইবনে হাজার রাহ. বলেন,

> 'খারেজিরা যখন বিরোধী পক্ষকে কাফের বলে আখ্যায়িত করল, তখন তারা তাদের রক্ত বৈধ মনে করল এবং জিম্মিদের ছেড়ে দিলো। তারা বলল, আমরা তাদের সঙ্গে কৃত প্রতিশ্রুতি রক্ষা করব। অনুরূপভাবে মুশরিকদের বিরুদ্ধেও তারা লড়াই করেনি; বরং তাদের ছেড়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে উঠেপড়ে লাগল। এসব কর্মকাণ্ড অজ্ঞতার উপাসকদের নিদর্শন; যাদের হৃদয় ইলমের নুর দ্বারা আলোকিত নয়। ইলমের কোনো অংশই তারা পায়নি। তাদের অজ্ঞতা ও ভ্রষ্টতার জন্য এটুকু যথেষ্ট যে, তারা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ফয়সালায় সন্তুষ্ট হয়নি। রাসুলকে তারা জালিম বলে আখ্যায়িত করেছে। আল্লাহ তাআলা আমাদের রক্ষা করুন।'[১৩৬]

আল্লামা ইবনে তাইমিয়া রাহ. বলেন,

> 'তারা গণ্ডমূর্খ। অজ্ঞতার কারণেই তারা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত থেকে পৃথক হয়ে গেছে।'[১৩৭]

---

[১৩৩] *তালবিসু ইবলিস* : ৯৩।
[১৩৪] আসসাবি প্রণীত *আল খাওয়ারিজ* : ১৮৭।
[১৩৫] *ফাতহুল বারি* : ১২/২৮৫।
[১৩৬] *ফাতহুল বারি* : ১২/৩০১।
[১৩৭] *মিনহাজুস সুন্নাহ* : ৩/৪৬৪।

এদ্বারা স্পষ্ট হয়ে যায়, অজ্ঞতার কারণে ইসলামের সাথে সম্পর্কিত একটি দলের এমন অধঃপতন। অতএব, বোঝা গেল অজ্ঞতা একটি অনিরাময়যোগ্য ব্যাধি। রোগী নিজে ধ্বংসের অতল গহ্বরে নিক্ষেপ হচ্ছে, অথচ সে টেরই পাচ্ছে না যে, সে একজন রোগী। বরং সে তাতেই কল্যাণ কামনা করছে এবং ক্ষতির মুখে পড়ছে।[১৩৮]

তিন. মুসলিম নেতার আনুগত্যের অস্বীকৃতি

ইমাম ইবনে তাইমিয়া রাহ. বলেন,

> 'খারেজিদের ভ্রষ্টনীতির একটি হচ্ছে, তারা হেদায়াত ও ইসলামের ইমাম ও মুসলিম জামাতের ব্যাপারে বেইনসাফির আকিদা পোষণ করে থাকে। তারা পথভ্রষ্ট। এটা সুন্নাত হতে বিতাড়িত রাফেজি ও তাদের মতো অন্য পথভ্রষ্ট ফেরকা হতে উৎসারিত। উপরন্তু যে কাজকে তারা অন্যায় ও জুলম মনে করে, সেটা তারা কুফরি হিসেবে গণ্য করে। এরপর সেই কুফরির ক্ষেত্রে এমন বিধান আরোপ করে যা তাদের নিজেদেরই উদ্ভাবিত ও আবিষ্কৃত।'[১৩৯]

একই সাথে তারা মুসলিম জামাতের নেতার আনুগত্য ও অনুসরণের প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়েছে। মুসলমানদের ঐক্যে ফাটল ধরাতে প্রাণপণ চেষ্টা চালিয়েছে। আমিরুল মুমিনিন হজরত আলি রা.-এর সম্পর্কে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি বিষয়টি আরও স্পষ্ট করে তোলে। তারা তাঁর আনুগত্য হতে সম্পূর্ণরূপে বেরিয়ে যায়। স্পর্শকাতর বিষয়গুলোতে তারা আলি রা.-এর বিরুদ্ধাচরণ আরম্ভ করে।[১৪০]

মুসলিম নেতাদের প্রতি বিরুদ্ধাচরণের এই ধারা ও নিদর্শন ইতিহাসের প্রতিটি ধাপেই অব্যাহত থাকে। এ ধরনের কোনো ব্যাপারে কেউ যদি তাদের বিরুদ্ধে কথা বলে, তার সাথে তারা বিদ্বেষ পোষণ করতে থাকে। ছুঁড়ে ফেলে দেয় তার অভিমত। একপর্যায়ে দেখা যায়, তাদের ফেরকাতেই কয়েকটি শাখা-উপশাখা জন্ম নিতে আরম্ভ করে। একে অন্যকে কাফের

---

[১৩৮] মুহাম্মাদ হাকিম তিরমিজি প্রণীত *নাওয়াদিরুল উসুল* : ৫৪; আসসাবি প্রণীত *আল খাওয়ারিজ* : ১৮৮।
[১৩৯] *আল ফাতাওয়া* : ২৮/৪৯৭।
[১৪০] আসসাবি প্রণীত *আল খাওয়ারিজ* : ১৯১।

আখ্যায়িত করে বেড়ায়। পরস্পরে খুনোখুনি, হাঙ্গামা ও বিদ্রোহ বৃদ্ধি পায় বহুগুনে।[১৪১]

চার. পাপের কারণে কাফের ফতোয়া দেওয়া এবং মুসলমানদের রক্ত ও সম্পদ বৈধ মনে করা

ইমাম ইবনে তাইমিয়া রাহ. বলেন,

> 'বেদআতি ও খারেজিদের আরেকটি পার্থক্য হচ্ছে, এরা পাপীকে তাকফির তথা কাফের ঘোষণা করে। সেই তাকফিরের ভিত্তিতে মুসলমানদের জান-মাল বৈধ মনে করে। তারা এই বিশ্বাস পোষণ করে যে, "দারুল ইসলাম" হচ্ছে "দারুল হারব"। আর তাদের নিজেদের আবাসস্থল হচ্ছে "দারুল ইমান"। অধিকাংশ রাফেজিও এই আকিদা লালন করে। এই দৃষ্টিভঙ্গি বেদআতের মূল। এ বিষয়ে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সুন্নাতের ইজমা রয়েছে। অন্যভাবে বলা যায়, ক্ষমাযোগ্য ভুলকে গোনাহ মনে করা এবং গোনাহকে কুফরি আখ্যায়িত করাই এই বেদআতের মূল দর্শন।'[১৪২]

খারেজিরা নিজেদের বিশেষ আকিদা ও চিন্তাধারার আলোকে মুসলিম জামাত হতে পৃথকভাবে বসবাস করে। তারা নিজেদের আকিদাকে আল্লাহর কাছে মুক্তিদাতা ধর্ম মনে করে। যারা তাদের বিরুদ্ধাচরণ করবে, তাদের ধারণামতে তারা ধর্ম হতে বেরিয়ে গেছে। তার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করা ওয়াজিব। এমনকি তাদের কোনো কোনো উপদল এতটাই বাড়াবাড়ির শিকার যে, তারা নিজেদের বিরুদ্ধবাদীদের জান-মাল বৈধ মনে করে।[১৪৩]

এর একটি উপমা হচ্ছে আবদুল্লাহ ইবনে খাব্বাবের ঘটনা। তাদের বিপরীত মত লালন করার কারণে তাঁকে হত্যা করা হয়েছে।[১৪৪]

---

[১৪১] আসসাবি প্রণীত আল খাওয়ারিজ : ১৯২।

[১৪২] আল ফাতাওয়া : ১৯/৭৩।

[১৪৩] মিনহাজুস সুন্নাহ : ৩/৬২।

[১৪৪] আল বাগদাদি প্রণীত আল ফারকু বাইনাল ফিরাক : ৫৭; আসসাবি প্রণীত আল খাওয়ারিজ : ১৯১।

আল্লামা ইবনে কাসির রাহ. বলেন,

> 'এসব লোক নিজেদের ধর্মবিশ্বাস ও দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তিতে নারী ও শিশুদের হত্যা করতে আরম্ভ করে। গর্ভবতী নারীর পেট ফেঁড়ে ফেলা বৈধ মনে করে। তাদের মতো অনাচার ও দুষ্কৃতি অন্য আর কেউ চালায়নি।'[১৪৫]

ইমাম ইবনে তাইমিয়া রাহ. বলেন,

> 'প্রথম বেদআত তথা খারেজিদের বেদআতের উৎপত্তি হয় কুরআন না-বোঝার কারণে। তারা ইচ্ছাকৃতভাবে কুরআন এবং নিজেদের চিন্তাধারার সাথে সংঘর্ষ সৃষ্টি করতে চায়নি। তারা কুরআনকে ওই অর্থে ব্যবহার করেছে, যা তার মূল অর্থ নয়। এই অজ্ঞতার কারণে তারা ভেবেছে, গোনাহে পতিত ব্যক্তিকে কাফের আখ্যা দেওয়া ওয়াজিব। কেননা, নেককার ও মুত্তাকিরাই পরিপূর্ণ মুমিন হতে পারে। তার মানে, যে ব্যক্তি নেককার ও মুত্তাকি হবে না সে কাফের। চিরদিন সে জাহান্নামে দগ্ধ হবে। এসব লোক উসমান রা. ও আলি রা. এবং তাঁদের উভয়ের সমর্থকদের ব্যাপারে বলত—এরা মুমিন নয়। কেননা, তাঁরা কুরআন ছাড়া অন্য বস্তুকে সালিশ বানিয়েছে। তাদের এই বেদআতের দুটি ভূমিকা ছিল :
>
> ১. যে ব্যক্তি ভুলে বা নিজের রায়ের মাধ্যমে কুরআনের বিরোধিতা করবে সে কাফের।
>
> ২. উসমান, আলি ও তাঁদের সমর্থকরা এ কারণে কাফের। (নাউজুবিল্লাহ)

সুতরাং গোনাহ ও ভুলের ভিত্তিতে ইমানদারকে কাফের আখ্যায়িত করা হতে বেঁচে থাকতে হবে। নিঃসন্দেহে এটা ছিল প্রথম প্রকাশ্য বেদআত। এই বেদআতে লিপ্ত ব্যক্তি; অর্থাৎ, খারেজিরা মুসলমানদের কাফের আখ্যায়িত করেছে। তাদের জান-মাল লুণ্ঠন বৈধ ভেবেছে। তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করা ও নিন্দার বিষয়ে বিভিন্ন গ্রন্থে বিশুদ্ধ হাদিস রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণিত আছে।'[১৪৬]

---

[১৪৫] *আল বিদায়া ওয়াননিহায়া* : ৩/২৯৪।
[১৪৬] *আল ফাতাওয়া* : ১৩/৩০, ৩১।

পাঁচ. রাসুল সা.-কে জালিম আখ্যায়িত করা

ইমাম ইবনে তাইমিয়া রাহ. বলেন,

> খারেজিরা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ব্যাপারে নিজেদেরকে স্বাধীন ভেবে নিয়েছে। তারা বলেছে, (নাউজুবিল্লাহ) রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জুলম করেছেন। নিজের সুন্নাতের ব্যাপারে ভ্রষ্টতার শিকার হয়েছেন। এই তথাকথিত অভিযোগের প্রেক্ষিতে তারা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনুগত্য ও অনুসরণকে ওয়াজিব মনে করত না। বরং এই জালিমরা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কেবল ওই পরিমাণ সত্য মনে করত যতটুকু কুরআনে এসেছে। তারা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওইসব সুন্নাত, বিধানাবলি ও নির্দেশাবলি মান্য করা জরুরি মনে করত না; যেগুলো তাদের মতে কুরআনবিরোধী হিসেবে বিবেচ্য।
>
> বর্তমানেও খারেজি ও বেদআতিদের অধিকাংশ তাদের পূর্বেকার খারেজিদের অনুসরণ করে থাকে। এই জালিমদের অভিমত—রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যদি কোনো মাসআলার ক্ষেত্রে তাদের উক্তি ও অভিমতের বিরুদ্ধাচরণ করেন, তাহলে ওইসব ক্ষেত্রে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসরণ করা যাবে না। বরং তারা সেটা নিজেদের প্রণীত প্রমাণের নিরিখে কার্যকর করবে, অথবা শরয়ি উদ্ধৃতিমূলক ভাষ্যকে রহিত করবে কিংবা পুনরায় হাদিস ও সুন্নাতকে নিজেদের মর্জি মোতাবেক ব্যাখ্যা করবে। কখনো সনদে আপত্তি তুলবে। কখনো ভাষ্যে দোষ দেখাবে। অথচ এরা মোটেই রাসুলের আনীত সুন্নাতমতে আমল করতে প্রস্তুত নয়। আর না প্রকৃতপক্ষে তারা কুরআনের অনুসরণ করছে।[১৪৭]

ছয়. দোষচর্চা ও ভ্রান্ত বলা

খারেজিদের সবচে স্পষ্ট নিদর্শন—এরা মুসলিম নেতৃবৃন্দকে ভ্রান্ত ও পথভ্রষ্ট বলে আখ্যায়িত করে। তারা বলে, 'এসব মুসলিম নেতৃবৃন্দ হেদায়াতের পথ

---

[১৪৭] *আল ফাতাওয়া* : ১৯/৭৩।

থেকে দূরে সরে গেছেন'। তাদের এই দোষ তাদের দলের প্রতিষ্ঠাতা জুলখুয়াইসারার দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা প্রকাশ পায়, যখন সে বলেছিল, 'হে আল্লাহর রাসুল, ইনসাফ করুন।'[১৪৮] আসলে এটা বলে সে নিজেকে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চেয়ে অধিক আল্লাহভীরু ও মুত্তাকি প্রমাণের চেষ্টা করতে চেয়েছে। সম্পদ বণ্টনের ক্ষেত্রে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর জুলম ও বেইনসাফির বিধান লাগিয়েছে। তাদের এ জাতীয় দোষ ইতিহাসের বাঁকে বাঁকে দৃশ্যমান। যার ফলে বহু মন্দ পরিণাম দেখা গিয়েছে। কেননা, এটা চাট্টিখানি কথা নয়; বরং এর ওপর বহু বিধান ও মাসআলা সম্পৃক্ত।[১৪৯]

সাত. কুধারণা

খারেজিদের আরেকটি চিন্তাধারা—কুধারণা পোষণ করা। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর জুলখুয়াইসারার মতো গণ্ডমূর্খ আপত্তি তুলেছে। রাসুলের বিরুদ্ধে বেইনসাফির অভিযোগ উত্থাপন করে বলেছে, 'আল্লাহর কসম! এই বণ্টন ইনসাফসিদ্ধ নয়। এতে আল্লাহর ভয়ের প্রতি লক্ষ রাখা হয়নি।'[১৫০]

হীন বোধ ও দুর্বল বুদ্ধির প্রেক্ষিতে জুলখুয়াইসারা যখন দেখল, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পদগুলো ধনিক শ্রেণির মাঝে বিতরণ করছেন এবং রিক্তহস্ত গরিবদের দিচ্ছেন না, তখন সে এটাকে কেন ভালো চোখে দেখল না—এটা এক বিস্ময়ের বিষয়। উদাহরণত সে ভাবতে পারত, বণ্টনকারী ব্যক্তি যেনতেন সাধারণ কোনো মানুষ নয়; বরং মহৎ ব্যক্তিত্বের অধিকারী ও হেদায়াতের রাসুল। সে সুধারণা রাখতে পারলে এটাই তার জন্য যথেষ্ট হতো। কিন্তু জুলখুয়াইসারা এটা কীভাবে মানবে! সে প্রাধান্য দিয়ে বসে আছে আত্মম্ভরিতাকে। শিকার হয়েছে কুধারণার। এই হীন মানসিকতার লোকটি 'ইনসাফ'-এর মতো সুন্দর শব্দটি ব্যবহার করতেও কুণ্ঠাবোধ করল না। ইবলিসও হেসে দিয়েছে তাকে দেখে। তার ওপর ধোঁকাবাজি ও প্রতারণার জাল বিছিয়ে দিয়েছে। তাতে সে আরও ফেঁসে গেছে।

---

[১৪৮] *বুখারি, ফাতহুল বারি* : ১২/২৯০।
[১৪৯] মুহাম্মাদ আবদুল হাকিম প্রণীত *জাহিরাতুল গুলু ফিদ্দিন* : ১০৬।
[১৫০] *বুখারি, ফাতহুল বারি* : ১২/২৯০।

অতএব, প্রত্যেক মানুষের উচিত; সে যেন নিজের হিসাব করে। নিজ কর্মকাণ্ড ও আচার-আচরণের কারণ, পাত্র ও উপলক্ষ যাচাই করে নেয়। প্রবৃত্তির অনুসরণ হতে ভীত থাকে। অভিশপ্ত ইবলিসের হিলা-বাহানা সম্পর্কে সজাগ থাকে। কেননা, সে অধিকাংশ ক্ষেত্রে মন্দ কাজকে খুবই চিত্তাকর্ষক আঙ্গিকে সুদৃশ্য প্রলেপ লাগিয়ে উপস্থাপন করে। হক ও সততার নামে কুকর্মের জন্য নানা টালবাহানা তালাশ করে।

সুতরাং এই পথে শয়তানি চাল থেকে রক্ষা পেতে এবং প্রবৃত্তির আনুগত্যের মায়াজালে নিক্ষিপ্ত না হওয়ার একটাই ওষুধ—ইলম। জুলখুয়াইসারার কাছে এই ইলমের কিঞ্চিত দ্যুতি বা বুদ্ধিমত্তার সামান্যতম অনুরণনও যদি থাকত, তবে সে ধ্বংসের এই ভয়াল প্রান্তরে ধ্বসে যেত না।[১৫১]

আট. মুসলমানদের বিরুদ্ধে চরমপন্থা

খারেজিরা পাষাণ, উগ্র ও কঠোরতাপ্রবণ হিসেবে প্রসিদ্ধ। তারা শুরুতেই মুসলামানদের বিরুদ্ধে পাষণ্ডতা ও চরমপন্থা দেখিয়েছে। নিন্দার চরম সীমায় পৌঁছেছে এই বাড়াবাড়ির মাত্রা। ফলে তারা মুসলমানদের জান-মাল, ইজ্জত-আব্রু ও স্ত্রী-সন্তানদেরকে নিজেদের জন্য হালাল মনে করল। তাঁদের হত্যা করা সওয়াবের কারণ ভাবতে লাগল। পৌত্তলিকদের মতো ইসলামের শত্রুদের থেকে চোখ ফিরিয়ে তারা মুসলমানদের কষ্ট দেওয়াকে বৈধ মনে করল। তাদের এ-ধরনের অনৈতিক বর্বরতার ঘটনায় ইতিহাসের পাতা টইটম্বুর। বেশি দূরে যাবার প্রয়োজন নেই। এই তো একটু আগেই আবদুল্লাহ ইবনে খাব্বাবের সাথে তারা যে আচরণ করল, তা তো আপনাদের সামনেই রয়েছে। সার্বিক অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে, মুসলমানদের সাথে তাদের আচরণ কড়াকড়ি, বাড়াবাড়ি, উগ্রপন্থা ও পাষণ্ডতায় ঠাসা। অথচ কাফেরদের সাথে তাদের আচরণ সদয়পূর্ণ, বন্ধুত্বপূর্ণ ও কোমল চিত্তের।[১৫২]

শরিয়তপ্রণেতার প্রকৃতি খুবই সহজ, মধ্যমপন্থী ও আমলযোগ্য। ইসলামের শিক্ষা হচ্ছে, একজন মুসলমান কাফেরদের বিরুদ্ধে হবে পাষাণ আর মুমিনদের বেলায় সদয় ও আন্তরিক হৃদ্যতাপূর্ণ। অথচ খারেজিরা তাদের

---

[১৫১] মুহাম্মাদ আবদুল হাকিম প্রণীত *জাহিরাতুল গুলু ফিদ্দিন* : ১০৬, ১০৭।
[১৫২] *জাহিরাতুল গুলু ফিদ্দিন* : ১০৬-১১১।

কথায়-কাজে এ নীতি সম্পূর্ণ উল্টিয়ে দিয়েছে।[১৫৩] আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

﴿مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ اللهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ﴾

'মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসুল এবং তার সহচরগণ কাফেরদের প্রতি কঠোর, নিজেদের মধ্যে পরস্পর সহানুভূতিশীল।' *-সুরা ফাতহ : আয়াত ২৯।*

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ﴾

'হে মুমিনগণ, তোমাদের মধ্যে যে স্বীয় ধর্ম থেকে ফিরে যাবে, অচিরে আল্লাহ এমন সম্প্রদায় সৃষ্টি করবেন, যাদেরকে তিনি ভালোবাসবেন এবং তারা তাকে ভালোবাসবে। তারা মুসলমানদের প্রতি বিনয়-নম্র হবে এবং কাফেরদের প্রতি হবে কঠোর। তারা আল্লাহর পথে জিহাদ করবে এবং কোনো তিরস্কারকারীর তিরস্কারে ভীত হবে না।' *-সুরা মায়িদা : আয়াত ৫৪।*

খারেজিরা এসব আয়াতের অর্থ সম্পূর্ণ বিকৃত করে ফেলেছে এবং মুসলমানদের কষ্ট দিতে বদ্ধপরিকর।[১৫৪]

এই হচ্ছে খারেজিদের কয়েকটি কুখ্যাত ও বড় ধরনের নিদর্শন। সংক্ষেপে আমরা উপস্থাপন করলাম।

---

[১৫৩] *ফাতহুল বারি : ১২/৩০১।*

[১৫৪] *জাহিরাতুল গুলু ফিদ্দিন : ১১১।*

অষ্টম পরিচ্ছেদ

বর্তমান যুগে খারেজিদের ভ্রান্তি ও বিকৃত চিন্তার কিছু নিদর্শন

এক. ধর্ম ও ইবাদতের নামে নিজের ক্ষেত্রে চরমপন্থা ও অন্যের জন্য সংকীর্ণতা

বর্তমান সময়ের চরমপন্থীদের একটি নিদর্শন—ধর্মে যে মধ্যমপন্থা ও সংযতচিত্ততার কথা বলা আছে এবং রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা প্রতিষ্ঠা করে গেছেন, তা হতে তারা বহুক্রোশ দূরে অবস্থান করছে। অথচ রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমনটি করতে নিষেধ করেছেন। হজরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত; রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ، وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلاَّ غَلَبَهُ، فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا، وَاسْتَعِينُوا بِالْغَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَيْءٍ مِنَ الدُّلْجَةِ

'নিশ্চয়ই দীন সহজ। দীন নিয়ে যে বাড়াবাড়ি করে দীন তার ওপর জয়ী হয়। কাজেই তোমরা মধ্যপন্থা অবলম্বন করো এবং (মধ্যপন্থার) নিকটে থাকো, আশান্বিত থাকো এবং সকাল-সন্ধ্যায় ও রাতের কিছু অংশে সাহায্য চাও।'[১৫৫]

দীনে বাড়াবাড়ি প্রকৃতপক্ষে দীন সম্পর্কে অজ্ঞতারই পরিণাম। এই উভয় দোষই রয়েছে খারেজিদের মধ্যে। বর্তমান সময়েও খারেজি চিন্তাধারা দ্বারা প্রভাবিত অধিকাংশ লোকের মধ্যে এই দোষ দুটি স্পষ্টরূপে প্রতিভাত হচ্ছে।[১৫৬]

---

[১৫৫] *সহিহ বুখারি মাআল ফাতহ* : ১.৯৩।
[১৫৬] নাসির আল আকল প্রণীত *আল খাওয়ারিজ* : ১৩০।

সহজ বিষয় এড়িয়ে চলা এবং অন্যকে সংকীর্ণতায় ফেলাও চরমপন্থার অংশবিশেষ। চরমপন্থীরা নিজেদের উদ্দীষ্ট ব্যক্তির যোগ্যতা ও সামর্থ্যের প্রতি ভ্রূক্ষেপ করে না। তাদের শক্তির পার্থক্য সম্পর্কে ধারণা রাখে না। মন-মানসিকতার তারতম্যের ব্যাপারে তাদের অবগতি নেই। ফলে শক্তি-সামর্থ্যের চেয়ে অধিক ভারি দায়িত্ব আঞ্জাম দিতে তাদের বাধ্য করা হয়। সহজ শরিয়তকে তাদের জন্য দুঃসাধ্য কর্মে রূপান্তর করে তোলে। এমন এমন কথা দ্বারা বক্তব্য রাখে, যা বোঝার সামর্থ্য শ্রোতার নেই।

অসার ভীতি, শরিয়তের বিধিবিধান সম্পর্কে অজ্ঞতা ও মানুষের মান-মর্যাদা সম্পর্কে ওয়াকিফহাল না-থাকার কারণে অন্যদের মধ্যে ব্যাপক সংকোচ ও সংকীর্ণতার সৃষ্টি হয়। বিভিন্ন ক্ষেত্রে নানারূপে এর বিবর্তণীয় রূপ দেখতে পাওয়া যায়। নিজ চিন্তাধারা গ্রহণে অন্যকে বাধ্য করা, সবাইকে নিজের কথা গেলানো, অসার-অপ্রামাণ্য তথ্য দ্বারা বিভ্রান্ত করা এবং শরয়ি ছাড় উপেক্ষা করে শরিয়তে নিষিদ্ধ কড়াকড়ি-বাড়াবাড়ি বিষয়সমূহ জোর করে পালন করতে বাধ্য করা তাদের অন্যতম নিদর্শন।

দুই. দম্ভের সাথে আত্মপ্রচার

বর্তমান যুগের চরমপন্থী ও উগ্রবাদীদের নিদর্শন এবং তাদের বিশেষ গুন হচ্ছে, তারা চরম আত্মম্ভরিতায় লিপ্ত। সবজান্তার ভাব থাকে সবসময় চেহারায়। অথচ শরয়ি ইলমের প্রাথমিক শিক্ষা এবং মৌলিক বিধিবিধান ও মূলনীতি সম্পর্কে তাদের ধারণা নেই। যদি কিছু ইলম থেকেও থাকে, তবে তা শরয়ি মূলনীতি, বিশুদ্ধ ফিকহ ও সঠিক রায়ের পরিপন্থী। তারা তাদের স্বল্পতর জ্ঞান আর অসার চিন্তা-চেতনা নিয়ে এতটাই গর্বিত ও আহ্লাদিত, যেন পূর্বাপর সকলের জ্ঞানের চেয়ে তার জ্ঞানভান্ডার সমৃদ্ধ। নিজ দম্ভের এই ছাঁচে তারা বিদগ্ধ আলেমগণের জ্ঞানকেও তুচ্ছ মনে করতে আরম্ভ করে। বন্ধ করে দেয় জ্ঞানান্বেষণের ধারা। এতে করে নিজে তো ধ্বংস হয়ই; অন্যকে ডুবিয়ে মারে ধ্বংসের অতলে।

খারেজিদেরও এমনই অবস্থা ছিল। তারা ইলম ও ইজতেহাদের দাবি করত। আলেমদের মুখে মুখে তর্ক করত। অথচ মূলত তারা ছিল মূর্খ ও অজ্ঞ। তাদের দাম্ভিক শ্রেণিটি অপরিপক্ক মন-মানসিকতাসম্পন্ন যুবক এবং অদূরদর্শীদেরকে ইলম ও ফিকহের দাওয়াতের ময়দানে নেতৃত্বের জন্য

লেলিয়ে দেয়। কিছু লোক ওইসব মূর্খদেরকে নিজেদের নেতা ও ধর্মীয় গুরু হিসেবে মান্য করে। পরে কী হতো? ওরা ইলম ও দূরদর্শিতা ব্যতিরেকে ফতোয়া দিতে আরম্ভ করল। বিচার শোনাতে লাগল। অনভিজ্ঞতা ও বুদ্ধিস্বল্পতার দরুন বহু দুর্দশা আর মুহুর্মুহু ক্ষতির সম্মুখীন হতে লাগল। তাদের অনেককে দেখা যায় যারা ওলামায়ে কেরাম ও মুসলিম মনীষীদের হেয়-প্রতিপন্নে কুণ্ঠাবোধ করে না। তাদের মান-মর্যাদার তোয়াক্কা করে না। হকপন্থী আলেমগণের কেউ যদি তাদের রায় ও চিন্তাধারার বিপরীতে ফতোয়া দিয়ে দেন, কিংবা তাদের দৃষ্টিভঙ্গির সাথে একাত্মতা পোষণ না করেন, তাহলে তারা সেই আলেমকে জেনেশুনে ভ্রান্তিতে পতিত, অপরিণত, হীনম্মন্য, অতি উদার এবং জ্ঞানস্বল্পতার অপবাদে অভিযুক্ত করে। কিংবা অন্য কোনো অশোভনীয় আচরণ করে; যা দ্বারা সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িকতা, মহা-ফিতনা, আলেমগণের অসম্মান ও অবিশ্বস্ততা ছাড়া ভিন্ন কিছু বৃদ্ধি পায় না। ফলে এর করুণ পরিণতি গোটা মুসলিম জাতিকে ইহকাল ও পরকালে সমানভাবে পোহাতে হয়।[১৫৭]

তিন. স্বীয় রায়ের প্রাধান্য ও অন্যকে অজ্ঞ মনে করা

উগ্রপন্থার একটি স্পষ্ট দিক—নিজের রায়ের ক্ষেত্রে গোঁড়ামি আর অন্যের রায়ের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন। অন্যের রায় যদি সঠিকও হয়ে থাকে, তবুও এরা জ্ঞানস্বল্পতা, আত্মম্ভরিতা ও অন্তঃসারশূন্য ধ্যান-ধারণার কারণে নিজের রায়কেই প্রাধান্য দেবে। গোঁড়ামি তবুও তাদের পিছু ছাড়বে না।

আমাদের পূর্বেকার যুগে আত্মপূজা ও নিজ চিন্তাধারার গোঁড়ামির কারণেই এই ব্যাধিতে আক্রান্তকে মৃত্যুর দুয়ারে পৌঁছিয়ে দিয়েছে। বলুন, এতদ্ভিন্ন কী এমন বিষয় আছে; যা জুলখুয়াইসারার মতো মূর্খ লোককে ডুবিয়েছে? ইবনুল জাওজি রাহ. বলেন,

> 'তার ধ্বংসের জন্য এটাই যথেষ্ট যে, সে নিজের রায়কে প্রাধান্য দিয়েছে। একটু অপেক্ষা করলে সে বুঝে নিতে পারত রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রায়ের চেয়ে উত্তম রায় আর হতে পারে না। জুলখুয়াইসারার সমবিশ্বাস লালনকারীদের অবস্থাও অনুরূপ। তারাও নিজেদের রায়কে সর্বাধিক বিশুদ্ধ মনে করে এবং অন্যের রায়কে ছুঁড়ে

[১৫৭] নাসির আল আকল প্রণীত *আল খাওয়ারিজ* : ১২৯।

ফেলে দেয়। খারেজিরাও ইবাদতগুজার ছিল। তবে তাদের বিশ্বাস ছিল—তারা আলি রা.-এর চেয়ে অধিক জ্ঞানী। এই মরণঘাতী ব্যাধি তাদের ধ্বংসের অতল গহ্বরে তলিয়ে নেয়।'[১৫৮]

এই বেচারারা মুষ্টিমেয় কিছু বাক্যে আবদ্ধ হয়ে যায়, যার অর্থও তারা ভালো করে বুঝতে সক্ষম হয়নি। এ ছাড়া এর মর্মোদ্‌ঘাটনে সক্ষম—এমন কাউকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেসও করেনি। নিজেই সবজান্তা—এই দৃষ্টিভঙ্গি ছিল তাদের। অন্যদের তারা অজ্ঞ ও ভ্রান্ত মনে করত।

মুহাম্মাদ আবু জুহরাহ লিখেন,

> 'ইমান', لا حكم إلا لله, 'জালিম হতে মুক্তি'—এই শব্দ-বাক্যগুলোর নেশায় তারা এতই বুঁদ হয়ে পড়ে যে, তারা এর বাহ্যিক অর্থের দিকে তাকিয়ে মুসলমানদের রক্ত হালাল মনে করে বসে। সর্বত্র হত্যাযজ্ঞ ও বিদ্রোহে মেতে ওঠে।[১৫৯]

এই অন্ধ গোঁড়ামি তাদেরকে সত্য গ্রহণে বাধা দেয়। অথচ সত্য তাদের সামনে উন্মুক্ত ছিল। আমিরুল মুমিনিন হজরত আলি রা. তাদের সাথে মুনাজারা করেছেন। বিতর্ক-বাহাস করেছেন ইবনে আব্বাস রা.। দূরীভূত করেছেন তাদের সন্দেহ ও আপত্তির বিষয়। স্পষ্ট দলিল-প্রমাণ দ্বারা বন্ধ করে দিয়েছেন তাদের মুখ। কিন্তু কিছুসংখ্যক লোক ছাড়া অন্যরা এতে সন্তুষ্ট হতে পারল না। তাদের কথা মানল না। উপরন্তু মুসলমানদের জান-মাল বৈধ মরতে লাগল। আসল কথা হচ্ছে, নিজের অভিমতকে প্রাধান্য দেওয়া এবং অন্যকে অজ্ঞ মনে করা ইসলামের অন্যতম মূলনীতি—যেমন : শূরাব্যবস্থা ও কল্যাণকামিতার পরিপন্থী।[১৬০]

চার. হক্কানি আলেমদের বিষোদ্‌গার ও বিদ্বেষ

বর্তমান সময়ে বেশ বিচিত্র ও বিস্ময়কর পরিস্থিতি দেখা যাচ্ছে। হক্কানি আলেমদের মানসম্মান ধুলোয় মিশিয়ে দেওয়ার প্রতিযোগিতা চলছে। এতে বিচ্যুতি ও ভ্রষ্টতার চাকু চালানোর চেষ্টা চলছে। এই আক্রমণ বড়ই শক্তিশালী। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা, সাময়িকী, প্রবন্ধ, গ্রন্থ, সেমিনার হল,

---

[১৫৮] *তালবিসু ইবলিস* : ৯০, ৯১।
[১৫৯] মুহাম্মাদ আবু যুহরাহ প্রণীত *তারিখুল মাজাহিবিল ইসলামিয়া* : ৬১।
[১৬০] *জাহিরাতুল গুলু ফিদ্দিন* : ২১৫-২২৩।

শ্রেণিকক্ষ ও শিক্ষাকেন্দ্রে এই আক্রমণের দৃষ্টান্ত দেখতে পাওয়া যায়। এই আক্রমণ ও চেতনাগত স্রোতধারা মুসলিম জাতির জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর। যারা পূর্ব হতে দিশেহারা তাদের পথ আরও বেঁকে যাচ্ছে। শুরু থেকে যারা গোত্রপ্রিয় ও আঞ্চলিকতার মোহজালে আড়ষ্ট, তারা আরও বেশি গোত্রপ্রিয় ও সাম্প্রদায়িক হয়ে উঠছে। ওলামায়ে কেরামের বিরুদ্ধে বিষোদ্‌গার ও বিদ্বেষের ধারা এমনিতেই চালু হয়নি; বরং এর পেছনে বহু প্রভাবক নিয়ামক শক্তি কাজ করছে। যেমন : শিক্ষক ছাড়া ইলম শেখা, আলেমগণের ভাষ্য ও বক্তৃতার উল্টো অর্থ বোঝা, আত্মম্ভরিতা ও হিংসা-বিদ্বেষ।

পরিতাপের বিষয়, আমাদের কিছু অতি উৎসাহী যুবক এক্ষেত্রে একধাপ এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে। তারা আলেমগণের দোষচর্চা ও ভুল-ত্রুটি খুঁটেখুঁটে বের করার কাজে উঠেপড়ে লেগেছে। তাঁদের বক্তৃতা ও ব্যক্তিগত চিন্তাধারা খণ্ডনে উচ্চকণ্ঠ হচ্ছে। সেগুলোতে এদিক-সেদিক করে সাধারণ মানুষের মাঝে বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে।

এমন কর্মকাণ্ডে ধোঁকায় পতিত হচ্ছে সাধারণ জনগণ। বিরুদ্ধবাদীদের কণ্ঠ রোধে এটাকে ব্যবহার করা হচ্ছে হাতিয়ার হিসেবে। এসব অদূরদর্শী বন্ধুদের এ-জাতীয় কর্মকাণ্ড ইসলামের জন্য আত্মঘাতি এবং ইসলামের শত্রুদের জন্য চোখ জুড়ানোর উপাদান। এমন নিকৃষ্ট কার্যক্রম অজ্ঞতা, জিঘাংসা ও আত্মিক ব্যাধির দলিল। হক্কানি আলেমগণ সবসময় এ বিষয়ে হুঁশিয়ার করেছেন। কেননা, এর মন্দ প্রভাব মুসলমানদেরকে সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত করে। কোনোরূপ চেষ্টা-তদবির ব্যতিরেকেই ইসলামের শত্রু ও ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারীরা এর সুফল ভোগ করে।

আল্লামা ইবনে তাইমিয়া রাহ. আলেম ও ইমামগণের দুর্বল উক্তি ও ব্যক্তিগত মতামতকে সাধারণ্যে পৌঁছাতে নিষেধ করতে গিয়ে বলেছেন,

> '... এ ধরনের জয়িফ মাসআলা মুসলিম ইমামগণের মধ্য হতে কোনো ইমামের কাছ থেকে উদ্ধৃত করা কারও জন্য বৈধ নয়। চাই তা খণ্ডন উদ্দেশ্য হোক বা তাতে আমল করা। কেননা, এর দ্বারা জয়িফ উক্তির প্রসারের পাশাপাশি ইমামের ব্যাপারে বিদ্বেষ-বিষোদ্‌গারও করা হয়ে থাকে। এ জাতীয় মাসআলার কারণে তাতারিদের এক গুপ্তচর মুসলমানদের মাঝে অনুপ্রবেশ করে আহলে সুন্নাতের মাঝে ফিতনার বীজ বপন করতে সক্ষম হয়। তাদেরকে নিজেদের আকিদা-বিশ্বাস

থেকে সে এমনভাবে পৃথক করে নেয় যে, একপর্যায়ে তারা নিজেদের বিরুদ্ধেই বিদ্রোহ করে বসে। পরে তারা রাফেজি ও নাস্তিক হয়ে যায়।'[১৬১]

যারাই মুসলিম জাতির হক্কানি ওলামায়ে কেরামগণের বিরুদ্ধে উচ্চকণ্ঠ হয়েছে এবং তাঁদের বিরুদ্ধে বিষোদ্‌গার করেছে, তারা ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায়—ইহুদি, খ্রিষ্টান ও তাগুতের ষড়যন্ত্র ও গুপ্ত মিশনের সেবা দিয়ে যাচ্ছে। জেনে হোক বা না-জেনে; এসব লোক আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত ও মধ্যপন্থী মতাদর্শ হতে দূরে সরে আছে। যারা বিশ্বাস করে—

> 'আলেম মনীষীগণ—পূর্ববর্তী যুগের হোক বা পরবর্তী যুগের; সর্বাবস্থায় তাঁরা নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পদাঙ্ক অনুসারী ছিলেন। ছিলেন কল্যাণের অনুগামী এবং ফকিহ ও দূরদর্শী। যখনই তাঁদের আলোচনা করা হবে, সৎ উদ্দেশ্যে কল্যাণের সাথে হবে। তাঁদের মান-মর্যাদার সাথে ধৃষ্টতা প্রদর্শনকারীরা সরল পথ থেকে ছিটকে পড়বে।'[১৬২]

হক্কানি আলেমগণের দোষচর্চা ও বিষোদ্‌গারকারীদের জেনে রাখা উচিত, ওইসব আলেমগণের গোশত বিষমিশ্রিত। তাদের শানে বিদ্বেষ পোষণকারীদের ব্যাপারে আল্লাহর সুন্নাত তো সবার জানা। সম্ভবত এসব অজ্ঞলোক জানে না, অধিক মর্যাদা এবং তাকওয়া ও আল্লাহভীতিই মানুষের ভালোমন্দের ব্যাপারে বিধান আরোপের মাপকাঠি।

ইমাম ইবনুল কায়্যিম রাহ. বলেন,

> 'শরিয়ত, ইতিহাস ও প্রত্যক্ষদর্শীরা এ ব্যাপারে সম্যক অবগত যে, যেসব মর্যাদাবান ব্যক্তি ইসলামের তরে উত্তম কীর্তি রেখে গেছেন, সুনাম অর্জন করেছেন, ইসলাম ও মুসলমানদের হৃদয়ে তাঁর উঁচু মর্যাদা রয়েছে; তাঁর পক্ষেও ভুল হতে পারে। কিন্তু তাঁকে সেক্ষেত্রে মাজুর তথা অপারগ মনে করতে হবে। তাঁর জন্য সওয়াবের প্রত্যাশা রাখতে হবে। কেননা, সেগুলো তাঁদের ইজতেহাদি ভুল ছিল। সেই ভুলের

---

[১৬১] *আল ফাতাওয়া : ৩২/১৩৭।*
[১৬২] *শারহুল আকিদাতিত তাহাবিয়া : ২/৭৪০।*

ক্ষেত্রে যেমন তাঁদের অনুসরণ করা যাবে না, তদ্রূপ মানুষের অন্তরে তাঁদের মান-মর্যাদায় আঘাত আসে বা সম্মানহানি হয়—এমন কাজও করা যাবে না।'[১৬৩]

উম্মতের হক্কানি আলেমদের যদি পর্যায়ক্রমে অভিযুক্ত করে তোলা যায়, তাহলে এই উম্মতের নেতৃত্ব দেবে কারা? একসময় এই নেতৃত্ব এমন অজ্ঞ যুবকদের হাতে চলে আসবে, যারা না ভালো করে কুরআন পড়তে পারে, না তাদের ভাষা ঠিক আছে আর না শরয়ি ইলম ও শাস্ত্রে তাদের ন্যূনতম দক্ষতা বা অভিজ্ঞতা আছে।

এই সংস্কৃতি তো ইসলামের শত্রুদের চোখ তৃপ্ত করে তুলবে। আর কেনই বা হবে না! এতে এমন এক প্রজন্ম তৈরি হয়ে যাবে, যাদের কোনো নেতা থাকবে না। প্রত্যেকেই বনে যাবে নিজ নিজ নেতা। পৃথিবীর বুকে এমন কোনো প্রজন্ম কখনোই সফল হয়নি; যাদের নেতৃত্ব নেই। পূর্বেকার যুগের জাতিদের সর্বনিকৃষ্ট ব্যক্তি হতো তাদের ধর্মীয় পণ্ডিত ও সন্ন্যাসীরা। তাদের মধ্যে থাকত ভ্রান্তি ও ভ্রান্ত লোকদের আধিক্য। কুরআন সাক্ষ্য দিচ্ছে—

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ﴾

> 'হে ইমানদারগণ, পণ্ডিত ও সংসারবিরাগীদের অনেকে লোকদের মালামাল অন্যায়ভাবে ভোগ করে চলছে এবং আল্লাহর পথ থেকে লোকদের নিবৃত রাখছে।' *-সূরা তাওবা : আয়াত ৩৪।*

অথচ মুসলিম জাতির সবচে পুতঃপবিত্র ব্যক্তিরা হচ্ছেন আলেমগণ। ইমাম শাবি রাহ. বলেন,

> 'মুসলমান ছাড়া অন্যান্য জাতির সবচে নিকৃষ্ট লোক ছিল তাদের আলেম তথা ধর্মীয় পণ্ডিতগণ। কিন্তু মুসলমানদের আলেমগণ হচ্ছেন তাদের বাছাইকৃত পবিত্র মানুষ। বিষয়টি এভাবেও বোঝা যেতে পারে যে, মুসলিম ছাড়া অন্য সব জাতি ও সম্প্রদায় পথভ্রষ্ট। আর তাদের ভ্রষ্টতার কারণ হচ্ছে তাদের ধর্মীয় পণ্ডিতরা। কারণ, তাদের ধর্মীয় পণ্ডিতেরা তাদের সবার মাঝে নিকৃষ্ট। পক্ষান্তরে গোটা মুসলিম জাতি

[১৬৩] *আলামুল মুআক্কিয়িন* : ৩/২৮৩।

হেদায়াতের ওপর রয়েছে। তাদের এই হেদায়াতের পথ দেখিয়েছে তাদের আলেমগণ। কেননা, তাদের আলেমগণ তাদের মধ্যে সবচে ভালো মানুষ।'[১৬৪]

পাঁচ. কুধারণা

বর্তমান যুগের অন্যতম একটি ব্যাধি হচ্ছে কুধারণা। এর ক্ষতিকর প্রভাব সমাজের অস্থি-মজ্জায় বিরাজমান। এটা এমন এক মহামারি, যা মানবসমাজকে খণ্ড-বিখণ্ড করে ছাড়ে অসংখ্য টুকরোয়। জাতি ধ্বংসের এক কার্যকর অস্ত্র এটা। সমাজে দেখা দেয় এর অসংখ্য ভয়ংকর প্রভাব। এই মহামারির পেছনেও কয়েকটি বিষয় প্রভাবক হিসেবে কাজ করে। তন্মধ্যে সর্বাধিক বেশি ভূমিকা রাখে অজ্ঞতা। পরিস্থিতির বাস্তবতা সম্পর্কে অজ্ঞতা কিংবা শ্রুত বা দৃশ্যমান বস্তুর প্রকৃতি সম্পর্কে অনবগতি ছাড়াও এর পেছনে কাজ করে যথাযথ শরয়ি ইলমের অভাব। বিশেষত সমস্যাটি যদি হয়ে থাকে কিছুটা অভিনব এবং অন্তর্দৃষ্টি ও গভীর বোধ বিনে যদি সেটা মানুষের মাথায় না আসে, তখন সে কুধারণা করতে আরম্ভ করে। অন্যকেও সেই দোষে অভিযুক্ত করতে শুরু করে। সে সোচ্চার হয় প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে।

কুধারণার আরেকটি হেতু হচ্ছে আত্মম্ভরিতা বা আত্মপূজা। এটা সমুদয় দুর্দশার মা। এমন কুধারণার জন্য এটুকু যথেষ্ট যে, কোনো মানুষের মধ্যে এমন কথা দেখতে পাওয়া; যা তার পছন্দনীয় নয়, বা গ্রন্থে এমন কোনো ভাষ্য পড়া যা তার মনমতো নয়; কিংবা কারও কাছ থেকে এমন কিছু শুনল, যা তার চাহিদা ও দৃষ্টিভঙ্গির বিপরীত। ব্যস, এটুকুই তার জন্য যথেষ্ট। তৎক্ষণাৎ সে কুধারণার দড়ি ঢিলে করে দেয়। ছেড়ে দেয় মুখের লাগাম—যেখানে ইচ্ছে সেখানে সে চড়ে বেড়ায়। আত্মপূজায় লিপ্ত এসব মানুষ ওইসব কারণসমূহকে শরিয়তের দাড়িপাল্লায় মেপে দেখে না। তার জন্য যুক্তিগ্রাহ্য কোনো ওজর সন্ধান করে না। বোধ-বিবেচনা তো দূরের বিষয়, নিজের ব্যক্তিগত ত্রুটির দিকেও সে দৃষ্টি দেবার অবকাশ পায় না। কেননা, আত্মপূজা তাকে এসব থেকে ফিরিয়ে রেখেছে।

কুধারণার আরেকটি কারণ হচ্ছে আত্মতুষ্টি ও অহংকার। কেউ যদি একটু চালাক-চতুর হয়, তাহলে নিজের বুদ্ধিমত্তার ওপর গর্ববোধ করা এবং নিজের

---

[১৬৪] *আল ফাতাওয়া* : ৭/২৮৪।

রায় সঠিক মনে করা তার আত্মশুদ্ধির পথে মারাত্মক বাধা। এমন ব্যাধিতে আক্রান্ত লোকেরা নিজের পক্ষে সাফাই গেয়ে থাকে আর অন্যকে তুচ্ছ জ্ঞান করতে আরম্ভ করে। সে মনে করে—আমি নিজেই ঠিক আছি; অন্যরা ভ্রান্তিতে। আমিই হক; অন্যরা বাতিল। আমি হেদায়াতপ্রাপ্ত; অন্যরা পথভ্রষ্ট।

আমি কিছু লোকের কুধারণার আশ্চর্য অবস্থা প্রত্যক্ষ করেছি। তারা নিজেকে ছাড়া অন্যের; চাই সে জীবিত হোক বা মৃত—পথভ্রষ্ট ও ভ্রান্ত আকিদার লোক মনে করে। সবার আকিদা ও চিন্তাধারায় সে কেবলই ভুল-বিচ্যুতি দেখতে পায়; যেন কোনো নিষ্ঠাবান লোক থাকলে কেবল সে-ই আছে। সবাই ধ্বংসের পথে, একমাত্র সে-ই আছে সঠিক পথে।

মোটকথা, নিঃসন্দেহে কুধারণা একটি মারাত্মক ব্যাধি। প্রতিটি ব্যাধিরই কিছু না কিছু ধ্বংসাত্মক ক্রিয়া থাকে; ধ্বংসাত্মক বিষয় ধ্বংসই জন্ম দেয়।

কুধারণা মানুষকে দোষচর্চা ও অন্যের ভুল-ত্রুটির অনুসন্ধানে প্ররোচনা দেয়। তাদের এই বিষক্রিয়া কেবল অন্যকেই ধ্বংস করে না; বরং স্বয়ং কুধারণাও আল্লাহর ক্রোধের কারণ। কেননা, এটা এমন এক প্রাণসংহারক ব্যাধি, যা কঠিন পরিণতি ডেকে আনবে বলে হুঁশিয়ার করেছেন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। তিনি বলেন,

> يَا مَعْشَرَ مَنْ آمَنَ بِلِسَانِهِ، وَلَمْ يَدْخُلِ الْإِيمَانُ قَلْبَهُ: لَا تغْتابُوا الْمُسْلِمِينَ، وَلَا تتبِعُوا عَوْرَاتِهِمْ، فَإِنَّهُ مَنِ اتبَعَ عَوْرَاتِهِمْ يَتبِعِ اللَّهُ عَوْرَتهُ، وَمَنْ يَتبِعِ اللَّهُ عَوْرَتهُ يَفْضَحْهُ فِي بَيْتِهِ
>
> 'হে লোকসকল, যারা মুখে নিজেদেরকে মুমিন বলে দাবি করে, অথচ ইমান তাদের অন্তরে প্রবেশ করেনি; তোমরা মুসলমানদের গিবত করবে না। তাদের গোপন দোষ তালাশ করবে না। কেননা, যারা অন্যের গোপন দোষ তালাশ করবে, আল্লাহ তাআলা তাদের দোষের হিসাব নেবেন। আর আল্লাহ যার দোষের হিসাব নেন, তাকে তার ঘরে অপদস্থ করেন।'[১৬৫]

কুধারণা মানুষকে গিবতের দিকে আহ্বান জানায়। অন্যের সম্মান বিনষ্টের ইন্ধন যোগায়। সর্বোপরি এই কুধারণা মুসলমানদের মাঝে সৃষ্টি করে

[১৬৫] মুসনাদে আহমাদ : ৪/৪২১-৪২৪।

মতবিরোধ। ভেঙে দেয় ভ্রাতৃত্বের বন্ধন। হৃদ্যতা ও ভালোবাসার চাদর সরিয়ে বিদ্বেষ, শত্রুতা, হিংসা ও কপটতার বীজ বপন করে। আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন এই ব্যাধির ধ্বংসাত্মক তাণ্ডব কত ভয়ংকর। এ কারণে ইসলাম এর লাগাম টেনে ধরতে খুবই কঠোর ভূমিকা নিয়েছে এবং কুধারণা থেকে দূরে থাকার প্রতি উৎসাহ দিয়েছে। কেননা, ইতিহাস সাক্ষী—কুধারণার পেছনে পড়ে যারা এর জালে আটকা পড়েছে, তাদের পরিণতি খুবই ভয়ংকর ও মারাত্মক ধ্বংসাত্মক। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ﴾

'হে ইমানদারগণ, তোমরা বহুবিধ ধারণা হতে দূরে থাকো; কারণ, কোনো কোনো ধারণা পাপ।' *-সুরা হুজুরাত : আয়াত ১২।*

হাফেজ ইবনে কাসির রাহ. বলেন, আল্লাহ তাআলা এই আয়াতে তাঁর বান্দাদেরকে 'বহুবিধ ধারণা' করতে নিষেধ করেছেন। অর্থাৎ, নিজের পরিবার, নিকটাত্মীয় ও সাধারণ লোকদের ওপর অপবাদ আরোপ করা এবং তাদেরকে যত্রতত্র খেয়ানতের অভিযোগে অভিযুক্ত করতে নিষেধ করেছেন। কেননা, কখনো কখনো এসব কথা মারাত্মক পাপের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। অথচ দেখা যায় এর তেমন বাস্তবতা নেই। সুতরাং এ থেকে রক্ষা পেতে যতদূর সম্ভব চেষ্টা করা আবশ্যক।

কুধারণা থেকে বেঁচে থাকার পন্থা হচ্ছে, যেই মুসলিম ভাইয়ের সম্পর্কে কুধারণার সৃষ্টি হচ্ছে তার জন্য ওজর তালাশ করা। অর্থাৎ, তার কথাবার্তা বা কার্যক্রমকে ন্যায়সঙ্গত কোনো অর্থে নেওয়া। হজরত উমর রা. বলেন,

'তুমি তোমার ভাইয়ের মুখ থেকে কোনো অসঙ্গত কথা শুনলে, যতক্ষণ পর্যন্ত তা কোনো ভালো অর্থে নেওয়া সম্ভব হয় ততক্ষণ পর্যন্ত তার ব্যাপারে ভালোই চিন্তা করো।'[১৬৬]

ছয়. অন্যের ওপর বাড়াবাড়ি ও উগ্রপন্থা

বর্তমান সময়ে উগ্রপন্থার একটি নিদর্শন হচ্ছে, অহেতুক অন্যের ওপর কড়াকড়ি আরোপ করা হয়। এটা এতটাই সাধারণ বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে, যেন অন্যের ব্যাপারে কঠোরতা ও কড়াকড়িই প্রত্যাশিত; হৃদতা-নম্রতা নয়।

---

[১৬৬] *তাফসিরে ইবনে কাসির : ৪/২১২।*

কতেক যুবকের ভেতর কঠোরতা ও উগ্রপন্থার প্রতি ঝোঁক একধরনের অভ্যাস হিসেবে স্থান করে নিয়েছে। কেবল কথা নয়, কাজেও তারা এমনটি দেখিয়ে যাচ্ছে। ফলে রক্ত ঝরছে নিরপরাধ মানুষের। ধ্বংস হচ্ছে জনবসতি। এর মন্দ পরিণতি কেবল উগ্রপন্থীদেরই নয়; বরং গোটা উম্মতকেই পোহাতে হচ্ছে। সুতরাং এটা বেশ ভাবনার বিষয় যে, যুবকেরা কোথা হতে এবং কেন এই উগ্রপন্থার আশ্রয় নিল? পরিস্থিতি ও পর্যবেক্ষণ দ্বারা অনুমিত হচ্ছে, এর পেছনে বেশ কিছু মৌলিক ও তাৎপর্যবহ নিয়ামক শক্তি কাজ করছে। সংক্ষেপে তা এভাবে বলা যায় :

পরীক্ষা ও দুর্দশা

দীনের দাওয়াতে নিবেদিতপ্রাণ যুবকদের উগ্রপন্থার দিকে ঝুঁকে পড়ার একটি কারণ হচ্ছে, এ পথে তাদের নানা ধরনের বিপদ ও পরীক্ষার মুখোমুখি হতে হচ্ছে। অনেক দুঃখ-কষ্ট তারা সহ্য করছে। প্রতিক্রিয়া হিসেবে তারা উগ্রপন্থা দ্বারা এর জবাব দিচ্ছে। একপর্যায়ে এটাই তাদের আরেক স্বভাবে পরিণত হয়ে যায়।

দাওয়াত ও তাবলিগের মূলনীতি সম্পর্কে অজ্ঞতা

দাওয়াত ও তাবলিগ দ্বারা আমার উদ্দেশ্য—সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ করা। এটা গোটা উম্মতের গুরুত্বপূর্ণ একটি দায়িত্ব। সুতরাং যারা এ পদে অধিষ্ঠিত তাঁদের দূরদৃষ্টি ও ফিকহ সম্পর্কে ধারণা থাকতে হবে; যাতে তাঁরা সহজে উম্মতের স্বার্থ সামনে রাখতে পারে এবং মন্দ প্রবণতা রুখতে পারে। এ ছাড়া আরও কিছু বিষয় তাঁদের জেনে রাখা আবশ্যক। তন্মধ্যে একটি হচ্ছে, এই দায়িত্ব কখনো অন্তর দ্বারা, কখনো মুখ দ্বারা, কখনো মুখ ও হাত দ্বারা পালন করা ওয়াজিব। এই জায়গাটায় অনেকে ভুল করে বসে। অসহিষ্ণুতা, অজ্ঞতা ও মূর্খতার কারণে কেবল হাত বা মুখ দ্বারা এই দায়িত্ব পালন করতে চায়। কী করা উচিত আর কী করা উচিত নয়—এটা সে দেখে না। এখন কোনটা পালনযোগ্য, কোনটা নয়—এসবের সে ধার ধারে না। ব্যস, এ পথে সে নিজের জবান চালায় এবং হাত চালায়, আর বিশ্বাস করে—সে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের আনুগত্য করছে। অথচ সে আনুগত্য করছে না; বরং শরিয়তের সীমারেখা ভেঙে দিচ্ছে।[১৬৭]

[১৬৭] আল ফাতাওয়া : ৮/২৭, ১২৮।

অনুরূপভাবে যাকে উদ্দেশ করে দাওয়াত দেওয়া হচ্ছে তার অবস্থা ও গ্রহণক্ষমতার প্রতিও লক্ষ রাখা জরুরি। এক্ষেত্রে যাঁরা কাজ করে থাকেন তাদের প্রতি আমার পরামর্শ—সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধের জন্য 'সিরাতুল মুতাকিম' তথা ভারসাম্যপূর্ণ সঠিক-সরল পথ গ্রহণ করবেন। চূড়ান্ত লক্ষ্যে পৌঁছার এটাই সবচে নিকটতম পন্থা। তদ্রূপ এ পথে নম্রতা ও কোমলতা অবলম্বন, সহিষ্ণু মনোভাব ও বিপদে ধৈর্যধারণও আবশ্যক। এ কাজের দায়িত্বশীলগণ যদি ধৈর্যশীল ও সহিষ্ণু না হন, তবে গড়ার চেয়ে ভাঙার প্রবণতাই সৃষ্টি হবে বেশি। মোটকথা, এ কাজে তিনটি বিষয় অতীব গুরুত্বপূর্ণ। যথা : ইলম, নম্রতা ও ধৈর্যশীলতা। অর্থাৎ, দায়িত্ব কাঁধে নেওয়ার পূর্বে সহিষ্ণুতা, দায়িত্ব কাঁধে নেওয়ার পর নম্রতা এবং ময়দানে অবতরণের পর তাতে ধৈর্যধারণ।

কাজি আবু ইয়ালা রাহ. বলেন, 'সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ তথা আল্লাহর পথে দাওয়াতের কাজ ওই ব্যক্তি পালন করবে, যে বুঝতে পারে যে, আমি কী বলছি এবং কী কাজ থেকে বারণ করা হচ্ছে—সেটাও আমি জানি।'[১৬৮]

এই হচ্ছে সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ-সংক্রান্ত কিছু জ্ঞাতব্য বিষয়। এসব বিষয় জানা না-থাকার কারণে এবং আল্লাহর পথে দাওয়াতের ক্ষেত্রে এসবের তোয়াক্কা না করার ফলে মানুষ উগ্রপন্থা ও বাড়াবাড়ির পথে এগিয়ে যায়।

আমাদের কতেক যুবক দাওয়াত, ওয়াজ ও তাবলিগের ময়দানে মানুষকে আত্মশুদ্ধির কথা বলতে গিয়ে এবং শরিয়তবিরোধী কাজ থেকে বাধা দিতে গিয়ে বাড়াবাড়ি ও কঠোরতা অবলম্বন করে থাকে। তারা মনে করে কঠোরতাই মন্দ কাজ উপড়ে ফেলবে; ফলে দীনের কাজ গতিশীল হবে। তাদের দৃষ্টি হতে কোমলপন্থা অদৃশ্য হয়ে আছে। অথচ এটা ছিল এই সফরের মূল পাথেয়। এর সমুদয় পথ যখন রুদ্ধ হয়ে যাবে, কেবল তখনই দ্বিতীয় পন্থা হাতে নেওয়া যেতে পারে। কেননা, এই নীতি বেশ কার্যকর ও প্রভাবক। কঠোরতা দ্বারা সাধারণত ঘৃণা জন্ম নেয়। প্রতিপক্ষকে ক্রুদ্ধ করে তোলে। আশ্চর্যের বিষয়; উগ্র চিন্তা লালনকারী যুবকেরা এটারই পার্থক্য করতে পারে

[১৬৮] আল ফাতাওয়া : ২৭/১৩৬, ১৩৭।

না যে, কে ইলমের ভিত্তিতে আমাদের বিরোধিতা করছে, আর কে অজ্ঞতার ভিত্তিতে। কারা বেদআতের দিকে ডাকছে, আর কারা ধোঁকার বশবর্তী হয়ে ভ্রষ্ট-পথে আত্মবলিদান দিচ্ছে! কোন পথ সর্বসম্মত আর কোন পথ মতানৈক্যপূর্ণ!

এসব অজ্ঞ যুবকদের মধ্যে একটি ঘৃণিত বিষয় এমনও দেখা যাচ্ছে যে, মাতা-পিতার সাথে তারা খুবই স্পর্ধার ও অপছন্দনীয় আচরণ করে। তাদের দৃষ্টিতে যেন এদের মান-মর্যাদা ও সম্মানের প্রতি লক্ষ রাখার কোনো মানে নেই। না তাদের সে সাহায্য করে, না সেবা। তারা ভুলে যায়—অন্যদের তুলনায় এদের উভয়ের রয়েছে পৃথক পৃথক মান-মর্যাদা। যে দাওয়াত ও তাবলিগের কাজ তারা আঞ্জাম দিয়ে যাচ্ছে, তা তাদেরই ফসল।

আমার আলোচনার উদ্দেশ্য এটা নয় যে, তাদের সন্তুষ্ট করার নিমিত্তে পাপে নিমজ্জিত হতে হবে, কিংবা ধর্মীয় কার্যক্রম ও দাওয়াতি কমসূচি থেকে হাত গুটিয়ে রাখতে হবে। না, কখনো নয়; বরং আমরা চাই তাঁদের সাথে যেন আমাদের আচরণ হয় শিষ্ট, শান্ত ও কোমল। সামাজিকভাবে তাঁদের প্রতি হৃদ্যতা যেন অটুট থাকে। তাঁদের অসঙ্গত কর্মকাণ্ডে ধৈর্যধারণ করতে হবে; তাঁরা যেন দায়ির পক্ষ থেকে শ্রদ্ধা ও ভালোবাসাপূর্ণ আচরণ পান। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ * وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾

'আর আমি মানুষকে তার পিতা-মাতার সাথে সদ্‌ব্যবহারের জোর নির্দেশ দিয়েছি। তার মাতা তাকে কষ্টের পর কষ্ট করে গর্ভে ধারণ করেছে। তার দুধ ছাড়ানো দু-বছরে হয়। নির্দেশ দিয়েছি, আমার প্রতি ও তোমার পিতা-মাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও। অবশেষে আমারই নিকট ফিরে আসতে হবে। পিতা-মাতা যদি তোমাকে আমার সাথে এমন বিষয়কে শরিক স্থির করতে পীড়াপীড়ি করে, যার জ্ঞান তোমার নেই; তবে তুমি তাদের কথা

মানবে না এবং দুনিয়াতে তাদের সাথে সদ্ভাবে সহাবস্থান করবে। যে আমার অভিমুখী হয়, তার পথ অনুসরণ করবে। অতঃপর তোমাদের প্রত্যাবর্তন আমারই দিকে এবং তোমরা যা করতে, আমি সে বিষয়ে তোমাদেরকে জ্ঞাত করব।' *-সুরা লুকমান : আয়াত ১৪-১৫।*

আমি আরও দেখেছি, আমাদের কতেক মুবাল্লিগ ভাই এমন লোকদের সাহায্যে এগিয়ে আসেন না যারা ভালোর পাশাপাশি কিছু মন্দ কাজেও লিপ্ত। তাদের মতে এসব লোক সেবা, উপকার ও কোনো প্রকার ভালো বিষয় পাবার উপযুক্ত নয়। আমাদের এই যুবক ভাইয়েরা শত্রুতা-মিত্রতার মর্ম ও তার সীমারেখা সম্পর্কে অবগত নন। ফলে বন্ধুত্ব ও মহব্বতের ওপর শত্রুতা ও ঘৃণা প্রাধান্য বিস্তার করে। তারা ভুলে যায়, সামাজিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করা ইসলামি দাওয়াতের অন্যতম উপাদান। কেননা, এটা বাস্তব ও দৃশ্যমান কাজ। কথার মোকাবিলায় এর দ্বারা অন্তর প্রভাবিত হয় বেশি।

তারা জানে না সামাজিক লেনদেন ও আচার-আচরণে আমাদের ক্রুদ্ধ স্বভাব ও অসহায়তাপূর্ণ ভূমিকা উদ্দীষ্ট ব্যক্তির হৃদয়ে বক্রতা ও হেয়ালিপনা সৃষ্টি করে। পক্ষান্তরে ইসলামের শত্রুরা এটা ব্যবহার করে তাদেরকে বিকৃত চিন্তার মানুষদের সারিতে ফেলে দেয়।

অনুরূপভাবে কঠোরতাপ্রবণ ও উগ্রপন্থীদের আরেকটি নিদর্শন হচ্ছে, অতি উৎসাহী এসব যুবকের অদূরদর্শী কঠোরতা অনেক সময় কথার গণ্ডি অতিক্রম করে হত্যা ও রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের সৃষ্টি করে। তারা আলেমদের রক্তাক্ত করে। নিরপরাধ প্রহরীদের রক্ত ভাসায়। রক্তাক্ত করে ঘটনার সাথে জড়িত নয় এমন অনেক নাগরিককে। শেষে এটা জেনে অবাক হওয়ার কিছু থাকে না যে, এরা কখনো কখনো পরস্পরই লড়াইয়ে লিপ্ত হয়ে পড়ে। একে অন্যের বিরুদ্ধে মুখ ও হাত চালায়।

আমার এ কথায় আশ্চর্যের কিছু নেই। আপনি আল্লাহর কিতাব, রাসুলের সুন্নাত ও সালফে সালেহিনের মতাদর্শ পরিপন্থী ফেরকাগুলোর ইতিহাস অনুসন্ধান করলে এসব ঘটনা দেখতে পাবেন। এই পথভ্রষ্ট সম্প্রদায় পরস্পর রক্তারক্তিতে লিপ্ত। একে অন্যকে পথভ্রষ্ট বলে বেড়ায়। একে অন্যকে কাফের বলে। এসব দেখে আমাদের আশ্চর্য হবার কিছু নেই। আখেরি নবি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মতাদর্শ ও হেদায়াত ছেড়ে দিলে এমনই পরিণতি হয়ে থাকে।

দাওয়াত, ওয়াজ ও তাবলিগ এবং মানুষের ব্যাপারে কঠোরতা ও কড়াকড়ি সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি একেবারে পরিষ্কার। আল্লাহ তাআলা মুসা আ. ও তাঁর ভাই হারুন আ.-কে নির্দেশ দিয়ে বলেন,

﴿اذْهَبَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ * فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ﴾

'তোমরা উভয়ে ফেরাউনের কাছে যাও, সে খুব উদ্ধত হয়ে গেছে। অতঃপর তোমরা তাকে নম্র-কথা বলো, হয়তো সে চিন্তা-ভাবনা করবে অথবা ভীত হবে।' *-সুরা তাহা : আয়াত ৪৩-৪৪।*

এই হচ্ছে ফেরাউনের মতো জালেমকে দাওয়াত দেওয়ার জন্য মুসা আ. ও তাঁর ভাই হারুন আ.-এর প্রতি আমাদের প্রতিপালকের দিকনির্দেশনা। অর্থাৎ, হকের দাওয়াত দিতে হবে কোমলভাবে, নম্র ভাষায়। কেননা, এই নীতিতে দাওয়াত গ্রহণ করতে মন-মানসিকতা দ্রুত প্রস্তুত হয়। মনে আল্লাহর ভয় তৈরি হয়। আল্লাহ তাআলা আরও বলেন,

﴿وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ * وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ﴾

'সমান নয় ভালো ও মন্দ। জবাবে তা-ই বলুন যা উৎকৃষ্ট। তখন দেখবেন আপনার সাথে যে ব্যক্তির শত্রুতা রয়েছে, সে যেন অন্তরঙ্গ বন্ধু। এ চরিত্র তারাই লাভ করে, যারা সবর করে এবং এ চরিত্রের অধিকারী তারাই হয়, যারা অত্যন্ত ভাগ্যবান।' *-সুরা হা-মিম : আয়াত ৩৪-৩৫।*

দাওয়াত ও তাবলিগের সদস্যরা এ পথে দুঃখ-দুর্দশার মুখে পড়তে পারেন। বরং নিশ্চিতভাবে নানা সমস্যার সম্মুখীন হয়েও থাকেন। তাই নিজের ভেতর ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার অনুশীলন জরুরি। আবেগের কাছে পরাজিত হওয়া যাবে না। মানুষকে ক্ষমা করতে শিখতে হবে। হজরত লুকমান আ. তাঁর ছেলেকে যে উপদেশ দিয়েছিলেন, আল্লাহ তাআলা তা উল্লেখ করে বলেছেন,

﴿يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنكَرِ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ﴾

'হে বৎস, সালাত কায়েম করো, সৎকাজে আদেশ দাও, মন্দকাজে নিষেধ করো এবং বিপদাপদে সবর করো। নিশ্চয় এটা সাহসিকতার কাজ।' *-সুরা লুকমান : আয়াত ১৭।*

দাওয়াতি কাজের প্রত্যেক সদস্যের উচিত, তাঁরা যেন দাওয়াতের ক্ষেত্রে তার শ্রোতার আবেগ নিয়ে খেলা না করে এবং তাঁর ওপর কঠোরতা চাপিয়ে না দেয়। বরং সবধরনের অন্যায় কথাবার্তা ও গালমন্দ হতে দূরে থাকা চাই। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ﴾

'তোমরা তাদেরকে মন্দ বলো না; যাদের তারা আরাধনা করে আল্লাহকে ছেড়ে। তাহলে তারা ধৃষ্টতা করে অজ্ঞতাবশত আল্লাহকে মন্দ বলবে।' *-সুরা আনআম : আয়াত ১০৮।*

দাওয়াত, ওয়াজ ও তাবলিগের ময়দানে নম্রতা ও কোমলতাকে প্রাধান্য দেওয়া এবং উগ্রতা ও কঠোরতা থেকে দূরে থাকা-সংক্রান্ত বহু হাদিস রয়েছে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

إِنَّ الرِّفْقَ لَا يَكُونُ فِي شَيْءٍ إِلَّا زَانَهُ، وَلَا يُنْزَعُ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا شَانَهُ

'যার ভেতর নম্রতা থাকে সেটা তার অলংকার। আর নম্রতা ফুরিয়ে গেলে সেটা তার দোষ হিসেবে সাব্যস্ত হয়।'[১৬৯]

অতএব, নম্রতা ও কোমলতাই দাওয়াত ও তাবলিগের প্রাণ। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, কঠোরতা সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয়ে যাবে। বরং প্রয়োজন সাপেক্ষে কঠোরতারও ব্যবহার হওয়া চাই। তবে তা হতে হবে যথাযথ স্থানে এবং সর্বশেষ পরিস্থিতিতে—যখন ধৈর্য ও নম্রতার সমুদয় উপাদান অকার্যকর হয়ে পড়বে। তাঁরাই সাহায্যপ্রাপ্ত যাঁদেরকে আল্লাহ তাআলা তাওফিক দান করেছেন এবং আত্মম্ভরিতা হতে রক্ষা করেছেন।[১৭০]

---

[১৬৯] মুসনাদে আহমাদ : ৪/৩৬২।
[১৭০] জাহিরাতুল গুলু ফিদ্দিন : ২৩১-২৩৭।

দ্বিতীয় অধ্যায়

আলি রা.-এর জীবনের শেষ দিনগুলো ও শাহাদত

প্রথম পরিচ্ছেদ

নাহরাওয়ান অভিযানের ফলাফল

আমিরুল মুমিনিন হজরত আলি রা. নাহরাওয়ানে খারেজিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন। তাদের বিরুদ্ধে তাঁর যুদ্ধ করা এ ব্যাপারে শক্তিশালী দলিল ও স্পষ্ট প্রমাণ বহন করে যে, সিরিয়াবাসীর বিরুদ্ধে তাঁর রণপরিকল্পনা নিশ্চয় সঠিক সিদ্ধান্ত ছিল। মুআবিয়া রা.-এর মোকাবিলায় তিনি ছিলেন হকের অধিক নিকটবর্তী। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদিস দ্বারা বিষয়টি প্রমাণিত। তিনি বলেছেন,

تَمْرُقُ مَارِقَةٌ عِنْدَ فُرْقَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، يَقْتُلُهَا أَوْلَى الطَّائِفَتَيْنِ بِالْحَقِّ

'মুসলমানদের মতবিরোধের সময় একটি সম্প্রদায় পৃথক হয়ে যাবে। তাদেরকে ওই দলটি হত্যা করবে যারা হকের অধিক নিকটবর্তী।'[১৭১]

এটা নিশ্চিত বিষয় যে, আলি রা.-এর বাহিনী সিরিয়াবাসীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে তুলনামূলক অধিক সম্মানের অধিকারী। কেননা, উপরোক্ত হাদিস এবং আম্মার ইবনে ইয়াসির রা.-এর শাহাদত ইত্যাদি স্পষ্ট প্রমাণাদি দ্বারা তিনি নিজ সঠিকতার ব্যাপারে নিশ্চিত ছিলেন। বাস্তবতা তো এমনই সম্ভাবনাময়; কিন্তু ফলাফল এর বিপরীত দেখা যাচ্ছিল। আলি রা.-এর পরিকল্পনা ছিল খারেজিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধশেষে সিরিয়াবাসীর ওপর আক্রমণ পরিচালনা করবেন। কেননা, সিরিয়াকে নিজ খেলাফতের অন্তর্ভুক্ত করা এবং উম্মতের

---

[১৭১] *সহিহ মুসলিম : ২/৭৪৫, ৭৪৬।*

ঐক্য ফিরিয়ে আনা ছিল খেলাফতের বুনিয়াদি দাবি। এই লক্ষ্য অর্জনে চেষ্টারও প্রয়োজন।

খারেজিদের বিরুদ্ধে তার যুদ্ধের উদ্দেশ্যও এটা ছিল যে, রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ সেনাক্যাম্প ও ঘাঁটিগুলো যেন নিরাপদে থাকে। অতর্কিত দুষ্কৃতিকারীরা যেন আমাদের অনুপস্থিতিতে দারুল খেলাফতে উপস্থিত মুসলিম শিশু ও নারীদের ওপর হামলা চালাতে না পারে। কিন্তু কী আর করা! বায়ু তো সবসময় নৌকার বিপরীত দিকেই প্রবাহিত হয়। পরিকল্পনামাফিক তিনি সিরিয়ায় যুদ্ধ পরিচালনা করতে পারলেন না; এর পূর্বেই শহিদ হয়ে গেলেন।

আমিরুল মুমিনিন হজরত আলি রা.-এর সামরিক শক্তি দুর্বল হয়ে পড়ছিল। কারণ, একদিকে যেমন খারেজিদের বিদ্রোহ নির্মূল করতে হয়েছে, অন্যদিকে উষ্ট্রী, সিফফিন ও নাহরাওয়ানের অভিযানগুলোতে অংশ নিয়ে ইরাকিরা এতটা ক্লান্ত হয়ে পড়েছে যে, বাড়তি আর কোনো যুদ্ধে যেতে তারা প্রস্তুতি নিতে পারছিল না। তারা যুদ্ধকে ঘৃণা করতে লাগল। বিশেষত সিফফিনে সিরিয়াবাসীর বিরুদ্ধে সংঘটিত যুদ্ধে তারা ব্যাপক পর্যুদস্ত হয়েছে। অন্যদের সঙ্গে যুদ্ধে তারা তেমন অভিজ্ঞ ছিল না। এ ছাড়া এক মুহূর্তের চিন্তা-ভাবনার সুযোগ না পাওয়ায় এতিম হয়েছে ইরাকবাসীর অসংখ্য শিশু। নারীরা হয়েছে বিধবা। একটি নিষ্ফল যুদ্ধ ছাড়া কিছুই তাদের হাতে আসেনি।

ওই সময়ে আমিরুল মুমিনিন হজরত আলি রা. এবং তাঁর সাথিরা যে সন্ধি ও সালিশকে স্বাগত জানিয়েছেন, সেটা যদি না হতো তবে মুসলিমবিশ্ব বিপুল ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হতো—যা কল্পনাও করা দুষ্কর। কেবল এ কারণেই আমিরুল মুমিনিন হজরত আলি রা.-এর সাথিরা পুনরায় সিরিয়ায় সেনা প্রেরণের প্রতি আগ্রহবোধ করছিলেন না। যদিও তারা নিশ্চিত ছিলেন যে, হজরত আলি রা.-ই হকের ওপর রয়েছেন।[১৭২]

এ ছাড়া আলি রা.-এর পথের কাঁটাস্বরূপ দেখা দেয় আরেক ফিতনা। সেই দিনগুলোতে এমন একটি ফেরকার অভ্যুদয় ঘটে, যারা আলি রা.-এর মান-মর্যাদাকে প্রভুত্বের আসনে পৌঁছাতে বদ্ধপরিকর। খারেজিদের বিপরীতে ছিল এই ফেরকার দৃষ্টিভঙ্গি।[১৭৩]

---

[১৭২] আবদুল হামিদ আলি প্রণীত *খিলাফাতু আলি বিন আবি তালিব* : ৩৪৫।
[১৭৩] আবদুল হামিদ আলি প্রণীত *খিলাফাতু আলি বিন আবি তালিব* : ৩৪৫।

অথচ বাস্তবতা এমন নয়। বরং ওই ফেরকার লক্ষ্য ছিল, ভ্রান্ত এই আকিদার মাধ্যমে কেবল আলি রা.-এর বাহিনীই নয়; বরং গোটা মুসলিম শক্তিকে দুর্বল করে দেওয়া এবং ইসলামের শিকড় সমূলে উৎপাটন করা।[১৭৪] এই অপশক্তিটির চ্যালেঞ্জও আলি রা. সম্পূর্ণ শক্তি, প্রত্যয় ও সাহসের সাথে মোকাবিলা করেন। এরা আপন লক্ষ্য পূরণে ব্যর্থ হয়।

যাইহোক, এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, আলি রা.-এর বাহিনী থেকে খারেজিদের বেরিয়ে যাওয়া এবং তৎপরবর্তী সময়ে তাদের বিরুদ্ধে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের ফলে তাঁর সামরিক শক্তি বেশ দুর্বল হয়ে পড়ে। পরে পর্যায়ক্রমে এক এক করে কাছে-দূরের বহু লোক আলি রা.-এর খেলাফত থেকে দূরে সরে যেতে থাকে। খুরাইজ ইবনে রাশেদ; অন্য উক্তিমতে যার নাম হারিস ইবনে রাশেদ—সে ছিল আলি রা. কর্তৃক নিযুক্ত আহওয়াজ এলাকার গভর্নর। সে তার গোত্র বনু নাজিয়ার লোকদেরকে আলি রা.-এর খেলাফতের বিরুদ্ধে প্ররোচনা দেয়। বহু লোক তার ডাকে সাড়া দেয়। সে তার অধীনস্থ বহু শহরে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে এবং লুণ্ঠন করে রাষ্ট্রীয় সম্পদ। আলি রা. মাকিল ইবনে কায়স আররিয়াহির নেতৃত্বে তার মোকাবিলার জন্য বাহিনী প্রেরণ করেন। তিনি খুরাইজ ইবনে রাশেদকে পরাজিত করে হত্যা করেন।[১৭৫]

দেশের এমন অরাজক পরিস্থিতি দেখে খারাজদাতারাও আলি রা.-এর খেলাফতকে দুর্বল করে দিতে সচেষ্ট হয়; যাতে খারাজ দেওয়া হতে মুক্তি পাওয়া যায়। আহওয়াজের অধিবাসীরা তো প্রতিশ্রুতি ভঙ্গই করে ফেলে। এমতাবস্থায় আলি রা.-এর আরও অধিক পরিমাণে রাষ্ট্রীয় সম্পদ ও সমরশক্তি ক্ষয় হবে—এটা স্বাভাবিক। এ ব্যাপারে ইমাম শাবি রাহ. হতে বর্ণিত; তিনি বলেন, আলি রা. যখন নাহরাওয়ানদের হত্যা করেন তখন বিপুলসংখ্যক লোক তাঁর বিরুদ্ধে চলে যায়। তাঁর আশপাশের লোকজন বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে এবং বনু নাজিয়াহ বিরোধিতা শুরু করে। এ সুযোগে ইবনুল হাজরামি বসরায় অভিযান চালায়। পাহাড়ী লোকেরা বিদ্রোহ ঘোষণা

---

[১৭৪] মুসতাফা হালামি প্রণীত *নিযামুল খিলাফাতি ফিল ফিকরিল ইসলামি* : ১৫, ১৬।
[১৭৫] আবদুল হামিদ আলি প্রণীত *খিলাফাতু আলি বিন আবি তালিব* : ৩৫০; *তারিখে তাবারি* : ৬/২৭-৪৭।

করে। যারা খারাজ দিত তারা খারাজ দেওয়া বন্ধ করতে উদ্যত হয়। পারস্যবাসী সাহল ইবনে হুনাইফকে সেখান থেকে বের করে দেয়। তিনি ছিলেন আলি রা. কর্তৃক নিযুক্ত পারস্যের শাসনকর্তা।[১৭৬]

অন্যদিকে হজরত মুআবিয়া রা. গোপনে-প্রকাশ্যে বিভিন্ন মাধ্যমে হজরত আলি রা.-এর সামরিক শক্তি দুর্বল করার চেষ্টা করে যাচ্ছেন। এ ছাড়া তিনি যখন আলি রা.-এর খেলাফতের মধ্যে অভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা দেখতে পেলেন, তখন এই সুযোগ কাজে লাগাতে আগ্রহী হন। এ লক্ষ্যে তিনি আমর ইবনুল আস রা.-এর নেতৃত্বে মিসর অভিমুখে সেনাবহর প্রেরণ করেন। সেখানে তিনি কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে ওই এলাকা নিজের রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে নেন। আমর রা.-এর এই বিজয় এবং মুআবিয়া রা.-এর এই রাজনৈতিক সফলতার পেছনে কয়েকটি কারণ ও উপকরণ রয়েছে। যথা :

- খারেজিদের বিরুদ্ধে আমিরুল মুমিনিন হজরত আলি রা.-এর জড়িয়ে যাওয়া।
- আলি রা. কর্তৃক নিযুক্ত মিসরের গভর্নর মুহাম্মাদ ইবনে আবি বকর তাঁর প্রাক্তন স্থলাভিষিক্ত কায়স ইবনে সাআদ ইবনে উবাদাহ আনসারির মতো দূরদর্শী না হওয়া। তিনি উসমান রা.-এর হত্যাকারীদের বিচারপ্রত্যাশীদের সাথে প্রতিশোধমূলক কর্মকাণ্ডের পরিস্থিতি সৃষ্টি করে দেন। এক্ষেত্রে তিনি বিচক্ষণতার পরিচয় দিতে ব্যর্থ হন; যেমনটি তার পূর্ববর্তী গভর্নর দিতে পেরেছিলেন। ফলে তিনি উসমান হত্যার বদলাপ্রত্যাশীদের কাছে পরাজয় বরণ করেন।
- মুআবিয়া রা. এবং উসমান রা. হত্যার বিচারপ্রত্যাশীদের চিন্তা-চেতনা অভিন্ন হওয়া। এই ঐকমত্যপূর্ণ রায়ের ফলে সহজেই মিসরে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়।[১৭৭]
- আমিরুল মুমিনিন আলি রা.-এর খেলাফতের রাজধানী মিসর থেকে দূরে এবং সিরিয়ার নিকটবর্তী হওয়া।

---

[১৭৬] *তারিখে তাবারি* : ৬/৫৩।

[১৭৭] *মুসান্নাফে আবদির রাজ্জাক*, *তাবাকাতে ইবনে সাআদ* : ৩/৮৩; আবদুল হামিদ আলি প্রণীত *খিলাফাতু আলি বিন আবি তালিব* : ৩৫১ [সনদ বিশুদ্ধ]।

- মিসরের ভৌগলিক অবস্থান যেহেতু সিনা'র সড়কের সীমান্তে সিরিয়ার ভূখণ্ডের সাথে লাগোয়া, তাই তা প্রাকৃতিকভাবে মনস্তাত্ত্বিক নৈকট্য বয়ে আনে। মিসরে মুআবিয়া রা.-এর নিয়ন্ত্রণ ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার পর তাঁর সামাজিক ও অর্থনৈতিক শক্তি বহুগুণে বৃদ্ধি পায়। তিনি এতে ক্ষান্ত হননি; বরং আরব উপদ্বীপের উত্তরাঞ্চল তথা মক্কা, মদিনা ও ইয়ামেন ইত্যাদি অঞ্চলেও নিজের সেনাবাহিনী প্রেরণ করতে লাগলেন। কিন্তু আলি রা. যখন সামরিক প্রতিরক্ষার চেষ্টা করেন, তখন তাঁর বাহিনী ভগ্ন মনোরথে ফিরে আসতে বাধ্য হয়।[১৭৮]

এ ছাড়া হজরত মুআবিয়া রা. বিভিন্ন গোত্রের নেতা এবং আলি রা.-এর গভর্নরদেরকে নিজের প্রতি আকৃষ্ট করার চেষ্টা চালান। যেমন, কায়স ইবনে সাআদ রা.—যিনি আলি রা. কর্তৃক নিযুক্ত মিসরের গভর্নর ছিলেন; তাঁকে তিনি নিজের প্রতি আকৃষ্ট করতে চেষ্টা করেন। কিন্তু সফল হননি।[১৭৯] তবে এটুকু অবশ্যই হয়েছে যে, আলি রা.-এর উপদেষ্টা ও তাঁর সাথিদের কাছে কায়স রা.-কে সন্দেহভাজন বানিয়ে দেওয়া হয়েছে। আলি রা. তাঁকে অপসারণ করেন। পরে কায়স ইবনে সাআদের এই অপসারণ মুআবিয়া রা.-এর পক্ষে অনেক বড় সাফল্য হিসেবে বিবেচিত হয়। অনুরূপভাবে তিনি পারস্যের গভর্নর জিয়াদ ইবনে আবিয়াকেও নিজের দলে ভেড়ানোর চেষ্টা করেছেন; কিন্তু সফল হননি।[১৮০]

মোটকথা, মুআবিয়া রা. বিভিন্ন গোত্রপ্রধান ও গভর্নরদের প্রতি নিজের অনুগ্রহ ও ভবিষ্যতে উত্তম পদের প্রতিশ্রুতির দেন। এটা তাঁদের ওপর প্রভাব ফেলে। এ ছাড়া এরা দিনদিন মুআবিয়া রা.-এর সফলতা প্রত্যক্ষ করছিল। ফলে একপর্যায়ে দেখা গেল আলি রা.-এর খেলাফতের কাজে বিশৃঙ্খলা দেখা দিলো; যা তিনি নিজেই তাঁর এক ভাষণে স্বীকার করেছেন—

> 'আমি জেনেছি; বুসর ইয়ামেনে প্রবেশ করেছে। আল্লাহর কসম! খুব শীঘ্রই ওই দল তোমাদের ওপর বিজয় লাভ করবে। আর তোমাদের

---

[১৭৮] তারিখে খলিফা : ১৯৮ [সনদবিহীন]।
[১৭৯] ওয়ালাইয়াতু মিসর : ৪৫-৪৬।
[১৮০] আল ইসতিয়াব : ২/৫২৫-৫২৬।

ওপর তাদের বিজয়ের কারণ হলো, তোমরা তোমাদের ইমামের বিরুদ্ধাচরণ করো, আর তারা তাদের ইমামের আনুগত্য করে। তোমরা খেয়ানত করো, আর তারা আমানত রক্ষা করে। তোমরা ভাঙার কাজে লিপ্ত আর তারা গড়ার কাজে ব্যাপৃত। আমি অমুককে পাঠিয়েছিলাম; সে খেয়ানত করেছে ও বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। অমুককে পাঠালাম; সে-ও খেয়ানত করল ও বিশ্বাসঘাতকতা করল এবং মালগুলো মুআবিয়ার নিকট পাঠিয়ে দিলো। তোমাদেরকে একটি পাত্রের আমানতদার বানালেও সেক্ষেত্রে আমার এখন আশঙ্কা হচ্ছে।

হে আল্লাহ, আপনি ওদেরকে নিকৃষ্ট বানিয়েছেন, তাই ওরা আমার সাথে দুর্ব্যবহার করে। আপনি ওদেরকে অপছন্দ করেন, তাই ওরা আমাকে অপছন্দ করে। হে আল্লাহ, ওদেরকে আমার থেকে নিষ্কৃতি দিন এবং আমাকেও ওদের থেকে মুক্ত করুন।'[১৮১]

[১৮১] বুখারি প্রণীত *আততারিখুস সাগির* : ১/১২৫ [সনদ বিচ্ছিন্ন। তবে এর অন্যান্য সাক্ষ্য রয়েছে]।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বাহিনীকে যুদ্ধের জন্য আলি রা.-এর উদ্দীপ্তকরণ ও মুআবিয়া রা.-এর সাথে যুদ্ধবিরতির সন্ধি

আমিরুল মুমিনিন হজরত আলি রা. উপরোল্লেখিত সমস্যার মুখোমুখি, সৈনিকদের নিস্তেজতা এবং যুদ্ধের প্রতি জনগণের অনিহা সত্ত্বেও মাথা নোয়াননি। বরং পরিপূর্ণ বিচক্ষণতা, যথাযথ প্রমাণ ও সাহিত্যপূর্ণ বক্তব্যের মাধ্যমে তিনি তাঁর সৈনিকদের সাহস যুগিয়ে যাচ্ছিলেন। এ ব্যাপারে রণ-উদ্দীপনা ও আত্মমর্যাদাবোধ-জাগৃতিমূলক যেসব ভাষণ প্রসিদ্ধ আছে, সাহিত্যের ইতিহাসে সেগুলো অত্যন্ত উঁচু স্থান দখল করে আছে। এগুলো তিনি কল্পনাবিলাসী হয়ে বলেননি; বরং সেটা ছিল এমন এক বাস্তবতা; যা তিনি নিজেই প্রত্যক্ষ করেছেন। সেসব ভাষণ ওই মর্মবিদারী পরিস্থিতিরই স্মারক বহন করে।

যখন তাঁর পার্শ্ববর্তী এলাকায় ও সীমান্ত-অঞ্চলে সিরিয়ান বাহিনী আক্রমণ করে তখন তিনি এই ভাষণ দেন—

> 'হামদ ও সালাতের পর। জিহাদ হচ্ছে জান্নাতের ফটকসমূহের মধ্যে একটি ফটক। যে ব্যক্তি জেনেবুঝে এর থেকে বিমুখ থাকবে, আল্লাহ তাআলা তাকে অপদস্থতার পোশাক পরাবেন। দুর্দশার পাহাড় তার মাথায় ভেঙে পড়বে। হীনতা ও বেইজ্জতিই তার ললাট-লিখন। পর্দা পড়ে যাবে তার অন্তরে। তাকে বঞ্চিত করা হবে তার ন্যায্য অধিকার থেকে। সে ন্যায় ও ইনসাফ থেকে বঞ্চিত থেকে যাবে।
>
> আমি তোমাদেরকে দিবানিশি সিরীয়দের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য বলে আসছি। তোমাদের বারবার বলছি, ওরা তোমাদের ওপর আক্রমণের পূর্বে তোমরা তাদের ওপর চড়াও হও। কেননা,

যে জাতির ওপর আক্রমণ করা হয় এবং যে এলাকায় তাদের শত্রুদের পা পৌঁছে যায়, তারা অপদস্থ ও পরাজিত না হয়ে পারে না। কিন্তু তোমরা আমার কথায় মোটেই কর্ণপাত করলে না। হাতের ওপর হাত রেখেই বসে রইলে। আমার উপদেশ তোমরা কঠিন মনে করলে। হাসি-ঠাট্টায় আমার কথা উড়িয়ে দিলে। এই উদাসীনতার যে কুফল, তা তোমাদের সামনেই। তোমাদের এলাকায় শত্রুরা চড়াও হয়েছে। দেখো, গামিদের ভাইয়ের (সুফইয়ান ইবনে আউফ গামিদি) ঘোড়া আনবারে[১৮২] এসে পৌঁছেছে। আমার কাছে সংবাদ এসেছে, ওইসব লোক মুসলমান এবং জিম্মি নারীদের কাঁকন, বালা ও চুল পর্যন্ত তুলে নিয়ে গেছে। ওরা হত্যা ও নৃশংসতার বাজার বেশ গরম করে চলেছে। নিজ অভিষ্ট লক্ষ্যে তারা সফলতার দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে ফিরে গেছে। অথচ তাদের কোনো লোক বিন্দু-পরিমাণ ক্ষতির সম্মুখীন হলো না। এরপরও যদি কোনো মুসলমান আফসোস আর দুঃখের কথা বলে, তবে সে আমার কাছে আর তিরস্কারের উপযুক্ত থাকবে না; বরং এমন মৃত্যু অহেতুক।

কী আশ্চর্যের কথা! একটি সম্প্রদায় বাতিল হওয়া সত্ত্বেও নিজেদের স্বার্থ পুরোপুরি আদায় করে নিতে প্রাণপণ চেষ্টা করে যাচ্ছে। আর তোমরা হকের ওপর থাকা সত্ত্বেও হীনম্মন্যতায় ভুগছ! পরিতাপের বিষয়—তোমরা শত্রুদের নিশানায় পড়ে গেছ। মনমতো ওরা তোমাদের ওপর তির চালাবে। তোমরা হয়ে পড়বে তাদের যুদ্ধলব্ধ সম্পদ। ইচ্ছেমতো তারা তোমাদের ওপর লুণ্ঠন চালাবে। অথচ তোমাদের আত্মমর্যাদাবোধ সম্পূর্ণরূপে মরে গেছে। তোমাদের এলাকায় খুন-খারাবির হাট জমে উঠেছে, অথচ এদিকে তোমাদের কোনো ভ্রূক্ষেপই নেই! তোমাদের ওপর আক্রমণ চালানো হচ্ছে, অথচ চুপ করে বসে আছ তোমরা। শত্রুর হামলার মুখোমুখী হওয়া সত্ত্বেও তাদের প্রতিরোধে তোমাদের কোনো আগ্রহ পরিলক্ষিত হচ্ছে না। ঘোষণা দিয়ে আল্লাহর অবাধ্যতা করা হচ্ছে, অথচ তোমাদের অন্তরে মোটেই

[১৮২] ফুরাতে পূর্ব তীরে অবস্থিত শহর।

ব্যথা সৃষ্টি হচ্ছে না। গ্রীষ্মকালে তোমাদেরকে সিরিয়া অভিমুখে পাঠাতে চাইলে তোমরা বলো—"এখন খুব গরম। আমাদের কিছু অবকাশ দিন। উষ্ণতা কমলে আমরা বেরোব।" কিন্তু যখন শীতকাল আসে, তখন কঠিন শৈত্যপ্রবাহের আপত্তি তুলে বলো—"শীত কমলে আমরা বেরোব।" না তোমরা গরমের তাপ সহ্য করতে পারো, না ঠান্ডা। তোমরা যখন গরম আর শীত থেকেই পলায়ন করো, তবে তো নিশ্চয় তরবারি থেকেও পলায়ন করবে।

হে ওইসব লোক—যাদেরকে দেখতে পুরুষের মতো মনে হয়, অথচ তোমরা পুরুষ নও! আমার ইচ্ছে করে, আল্লাহ তাআলা যদি আমাকে তোমাদের মাঝ থেকে তুলে নিতেন! তোমাদের চেহারাও আমি আর দেখতে চাই না। তোমাদের সাথে তো এখন আমার আর কোনো সম্পর্কই নেই। আল্লাহর শপথ! আমি ভীষণ লজ্জিত। তোমরা আমার অন্তরকে ক্রুদ্ধ-বিক্ষুব্ধ করে তুলেছ। তোমরা আমাকে মৃত্যুর দুয়ারে পৌঁছিয়ে দিতে চাও। তোমরা আমার সাথে গাদ্দারি করেছ। আমার নির্দেশ অমান্য করে, আমাকে ছেড়ে দিয়ে আমার সকল পরিকল্পনা ধুলোয় মিশিয়ে দিয়েছ। যার কারণে কুরাইশরা আজ বলছে—আবু তালিবের ছেলে বীর তো বটে; কিন্তু সে রণকৌশল জানে না। আল্লাহ তাদের কল্যাণ করুন। তাদের মধ্যে কেউই আমার চেয়ে অধিক সমর-অভিজ্ঞতা ও রণদক্ষতার অধিকারী নয়। যুদ্ধ সম্পর্কে যে পরিমাণ দীর্ঘ অভিজ্ঞতা আমার অর্জিত হয়েছে, আর কেউ তা অর্জন করতে পারেনি। ২০ বছর বয়সে পৌঁছতে না পৌঁছতেই রণদক্ষতা আমার অর্জন হয়। এখন আমার বয়স প্রায় ৬০ বছর। কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত কোনো রায় বা পরামর্শ কাজে পরিণত করা না যাবে, ততক্ষণ সেই রায় বা পরামর্শ কোনো সুফল বয়ে আনবে না।'[১৮৩]

প্রকৃতপক্ষে আলি রা.-এর এই ভাষণ ছিল একটি অগ্নিস্ফুলিঙ্গ। যা তিনি এমন এক জাতির মাথায় নিক্ষেপ করেছিলেন, যারা তাঁকে তাঁর জিহাদি

---

[১৮৩] আল জাহিয প্রণীত *আল বায়ান ওয়াত তিবয়ান* : ২৩৮, ২৩৯।

পরিকল্পনা বাস্তবায়ন হতে বঞ্চিত রেখেছেন। যে উদ্দেশ্য তিনি বাস্তবায়ন করতে চেয়েছিলেন, তারা সে পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তিনি তাঁর ধারণা এবং পরে তার বিপরীত ফলাফল দেখে দুঃখে-ক্ষোভে এমন উন্নত ও সাহিত্যপূর্ণ ভাষ্যে নিজের আবেগ প্রকাশ করেন। তাঁর ভাষণ ছিল অত্যন্ত স্পষ্ট। তিনি কোনো ধরনের সন্দেহ, সংশয় ও রাখঢাক রাখেননি।[১৮৪]

এখানে একটি বিষয় উল্লেখ না করলে নয়; তা হচ্ছে—আমিরুল মুমিনিন হজরত আলি রা.-এর খেলাফতের ব্যাপারে তাঁর যে ভাষণ বর্ণিত আছে এবং খেলাফতের বাহ্যিক গুণাবলির বিপরীতে ইতিহাসের যে দৃশ্য দেখা যাচ্ছে, প্রকৃতপক্ষে ভাষণটি তিনি দিয়েছিলেন নাহরাওয়ানে অভিযানের পর। তখনকার করুণ ও প্রতিকূল পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে তিনি খুবই বিমর্ষ হয়ে পড়েন। সেই দুঃখের কথাই প্রতিভাত হয়েছে তাঁর ভাষণে। তিনি জাতির পূর্বাপর অবস্থা প্রত্যক্ষ করে খুবই দুঃখ পান। মনোকষ্টে ভোগেন। কিন্তু পরিতাপের বিষয় হচ্ছে, তাঁর প্রতি সম্পৃক্ত অধিকাংশ ভাষণ বিশুদ্ধ সূত্রে বিবৃত নয়। কয়েকজন আলেম *নাহজুল বালাগায়* উল্লিখিত আলি রা.-এর ভাষণের ব্যাপারে বলেছেন, এগুলো সব শারিফ আররাজি'র বানোয়াট ভাষণ।[১৮৫] সুতরাং ঐতিহাসিক সূত্রের আলোকে সেগুলো উপস্থাপনে আমাদের আরও দূরদর্শী ও বিচক্ষণতার পরিচয় দিতে হবে।

এতদ্‌ভিন্ন আরেকটি প্রেক্ষিতেও আলি রা. তাঁর লোকদেরকে যুদ্ধের প্রতি উদ্দীপ্ত করার চেষ্টা করেছিলেন। সেটা হলো, তিনি তাঁর সাথিদেরকে নিজের ফাজায়েল, মর্যাদা এবং ইসলামে তাঁর উঁচু মর্যাদার বিষয়টি স্মরণ করিয়ে দিচ্ছিলেন। যারা এই দৃশ্য দেখছিল তারা বলছেন—আলি রা. উন্মুক্ত প্রান্তরে মানুষকে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওই ফরমানের সূত্রে সাহায্যের জন্য ডাকছিলেন যে, কে আছ! জনাকীর্ণ দিনে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে একথা বলতে শুনেছ—'তোমরা কি জানো না, আমি মুমিনদের কাছে তাদের প্রাণাধিক প্রিয়?' লোকেরা বলল, 'হ্যাঁ, কেন নয়'? তখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'তাহলে আমি যার বন্ধু, আলিও তার বন্ধু। হে আল্লাহ, যে তাঁকে বন্ধু বানাবে, তুমি তাঁর

---

[১৮৪] নায়েফ মারুফ প্রণীত *আল আদাবুল ইসলামি* : ৫৯।
[১৮৫] *মিযানুল ইতিদাল* ৩/১২৪; *খিলাফাতু আলি বিন আবি তালিব* : ৩৫৫।

প্রিয় হয়ে যাও। আর যে তাঁর সাথে বিদ্বেষ পোষণ করবে, তুমি তার শত্রু হয়ে যাও।'

একথা শুনে ১২ জন লোক মতান্তরে ১৬ জন লোক দাঁড়িয়ে একথার সত্যতা ব্যাপারে সাক্ষ্য দেয়।[১৮৬]

হজরত আলি রা.-এর এই ভূমিকা আমাদেরকে হজরত উসমান রা.-এর জীবনের শেষ সময়কার স্মৃতি তাজা করে দেয়—যখন দুষ্কৃতিকারীরা তাঁকে অবরুদ্ধ করে রেখেছিল। আর তিনি তাঁর ফাজায়েল ও মর্যাদার সাক্ষী তাঁর সামনে উপস্থিত সাহাবাদের কাছ থেকে নিচ্ছিলেন। যেন তিনি বলতে চাচ্ছিলেন—যার এমন মহৎ মর্যাদা, ইসলামের তরে যার এমন ত্যাগ; তাঁর বদলা কি এমন হতে পারে?

যাইহোক, এসব উদ্দীপনা ও অনবরত চেষ্টার পরও আলি রা. নিজ পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে সক্ষম হননি। অর্থাৎ, দেশের অভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা, সৈনিকদের অসন্তুষ্টি, তাদের পারস্পরিক অসহযোগী মনোভাব ও আত্মম্ভরিতার ফলে সিরিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা সম্ভব হয়নি। বাধ্য হয়ে ৪০ হিজরিতে মুআবিয়া বিন আবি সুফইয়ান রা.-এর সাথে এ শর্তে সন্ধি করতে রাজি হয়ে যান যে, ইরাক আমার নিয়ন্ত্রণে থাকবে, আর সিরিয়া তাঁর (মুআবিয়া) নিয়ন্ত্রণে থাকবে। উভয়ের মধ্যে কেউই অন্যের কাজে সামরিক হস্তক্ষেপ, অতর্কিত আক্রমণ বা যুদ্ধের মাধ্যমে প্রভাব বিস্তার করতে পারবে না। তাবারি রাহ. তাঁর ইতিহাসগ্রন্থে লিখেন—

> '৪০ হিজরি সনে আলি ও মুআবিয়ার মধ্যে অনেক পত্র লেখালেখির পর সন্ধিচুক্তি সাক্ষরিত হয়। চুক্তিতে বলা হয়—উভয় পক্ষের মধ্যে আর কোনো যুদ্ধ সংঘটিত হবে না। ইরাকের কর্তৃত্ব থাকবে আলির হাতে এবং সিরিয়ার কর্তৃত্ব থাকবে মুআবিয়ার হাতে। এক পক্ষ অন্য পক্ষের ওপর হামলা, সৈন্য চালনা ও ধ্বংসাত্মক কার্যক্রম গ্রহণ করবে না।'[১৮৭]

---

[১৮৬] *ফাজায়িলুস সাহাবাহ* : ২/৭০৫ [সনদ বিশুদ্ধ]।
[১৮৭] *তারিখে তাবারি* : ৬/৫৬।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

শাহাদত প্রার্থনার দুআ

আমিরুল মুমিনিন হজরত আলি রা. হজরত মুআবিয়া রা.-এর সাথে সন্ধিচুক্তি তো করে নিয়েছেন; কিন্তু মনে হচ্ছিল এই সন্ধিচুক্তি বেশি দিন টেকেনি। কেননা, যে বছর আলি রা. শহিদ হন, ওই বছর মুআবিয়া রা. হেজাজ ও ইয়ামেন ইত্যাদি এলাকায় বুসর বিন আরতাতকে সামরিক বাহিনী দিয়ে প্রেরণ করেন।[১৮৮]

যাইহোক, যখন আলি রা. নিজের বাহিনীকে নিজ লক্ষ্য পূরণে নিয়ে যেতে সক্ষম হলেন না এবং তাদের পিছুটান ও হীনম্মন্যতা দেখতে পেলেন, তখন তিনি বেঁচে থাকার চাইতে মৃত্যুকে প্রাধান্য দিলেন। আল্লাহর দিকে মনোযোগী হলেন এবং দ্রুত এই নশ্বর পৃথিবী থেকে উঠিয়ে নেওয়ার জন্য দুআ করতে লাগলেন। তিনি একদিন খুতবা দিতে গিয়ে বলেন,

اللَّهُمَّ إِنِّي قَدْ سَئِمْتُهُمْ وَسَئِمُونِي ، وَمَلَلْتُهُمْ وَمَلُّونِي ، فَأَرِحْنِي مِنْهُمْ وَأَرِحْهُمْ مِنِّي

'হে আল্লাহ, আমি এদের নিরাশ করেছি। তারাও আমাকে নিরাশ করেছে। সুতরাং তুমি তাদের কাছ থেকে আমাকে মুক্তি দাও এবং তাদেরকেও আমার কাছ থেকে মুক্তি দাও।'

অতঃপর দাড়িতে নিজ হাত রাখলেন। বলতে লাগলেন, 'তোমাদের সবচে নিকৃষ্ট লোক (খুনি)-এর জন্য আর কোনো বাধা নেই যে, সে এটাকে (দাড়ি) রক্তে রঞ্জিত করবে।'[১৮৯]

তিনি তাঁর জীবনের শেষ দিনগুলোতে খুবই কায়মনোবাক্যে দুআ করতেন। জুনদুবের বর্ণনা—লোকজন আলি রা.-এর কাছে সমবেত হলে তিনি

---

[১৮৮] বুখারি প্রণীত *আততারিখুস সাগির* : ১/৪১; *খিলাফাতু আলি বিন আবি তালিব* : ৪৩১।

[১৮৯] *মুসান্নাফে আবদির রাজ্জাক* : ১০/১৫৪ [সনদ বিশুদ্ধ]; *তাবাকাত* : ৩/৪ [সনদ বিশুদ্ধ]।

বললেন, 'হে আল্লাহ, আমি তাদের পরাজিত করেছি, তারাও আমাকে পরাজিত করেছে। আমি তাদের ঘৃণা করেছি, তারাও আমাকে ঘৃণা করেছে। সুতরাং আপনি তাদেরকে আমার হতে এবং আমাকে তাদের হতে মুক্তি দিন।'[১৯০]

অন্য বর্ণনায় এসেছে; আবু সালিহ বলেন, আলি রা. তাঁর মাথায় মাসহাফ রেখেছিলেন। আমি তখন তাঁর কাছে উপস্থিত ছিলাম। আমি পৃষ্ঠা উল্টানোর আওয়াজ শুনলাম। তিনি দুআ করছিলেন—

> 'হে আল্লাহ, আমি ওদের কাছে তা-ই চেয়েছি যা এই কুরআনে আছে। কিন্তু তারা তা আমাকে দেয়নি। হে আল্লাহ, আমি তাদের কষ্ট দিয়েছি, তারাও আমাকে কষ্ট দিয়েছে। আমি তাদের ঘৃণা করেছি, তারাও আমাকে ঘৃণা করেছে। তারা আমাকে এমন বিষয়ে বাধ্য করেছে যা আমার অপছন্দনীয়। সুতরাং আপনি তাদেরকে আমার স্থলে আমার চেয়েও মন্দ শাসক অধিষ্ঠিত করুন। আর আমাকে তার পরিবর্তে তাদের চেয়ে ভালো লোক দান করুন। ওদের মন এমনভাবে গলিয়ে দিন, লবণ যেমন পানিতে গলে যায়।'[১৯১]

এক বর্ণনামতে, এই দুআর মাত্র তিনদিন পর তিনি শাহাদত বরণ করেন।[১৯২]

হজরত হাসান ইবনে আলি রা. বলেন, আমাকে আলি রা. বলেছেন—আজ রাতে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়েছে। আমি বললাম, 'হে আল্লাহর রাসুল, আপনার উম্মত আমার সাথে খুবই ঝগড়া ও বক্রতার আচরণ করছে।' রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'তুমি তাদের বদদুআ করো।' তখন আমি এই দুআ করলাম, 'হে আল্লাহ, এর বদলাস্বরূপ আপনি আমাকে এদের চেয়ে ভালো মানুষদের সঙ্গী বানান, আর তাদেরকে আমার স্থলে আমার চেয়ে মন্দ শাসক অধিষ্ঠিত করুন।' হাসান রা. বলেন, এরপর তিনি বাইরে গেলেন এবং এক লোক তাঁকে শহিদ করে দিলো।[১৯৩]

---

[১৯০] ইবনে আবি আসিম প্রণীত *আল আহাদ ওয়াল মাসানি* : ১/৩৭ [সনদ বিশুদ্ধ]; *খিলাফাতু আলি বিন আবি তালিব* : ৪৩২।
[১৯১] *সিয়ারু আলামিন নুবালা* : ৩/১৪৪।
[১৯২] *খিলাফাতু আলি বিন আবি তালিব* : ৪৩২।
[১৯৩] জাহাবি প্রণীত *তারিখুল ইসলাম আহদিল খুলাফাইর রাশিদিন* : ৬৪৯।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

আমিরুল মুমিনিন রা. তাঁর শাহাদতের বিষয়টি জানতেন

দালায়িলুন নাবুওয়াতের অন্তর্ভুক্ত কিছু কিছু হাদিস দ্বারা অনুমিত হয়, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আলি রা.-এর শাহাদতের বিষয়ে ভবিষ্যদ্‌বাণী করেছিলেন। *সহিহ মুসলিম*-এ হজরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত; রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হেরা পর্বতে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন আবু বকর, উমর, উসমান, আলি, তালহা ও জুবাইর রা.। পর্বত কাঁপতে লাগল। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'থেমে যাও হেরা! তোমার ওপর নবি, সিদ্দিক ও শহিদ ছাড়া আর কেউ নেই।'[১৯৪]

এ ছাড়া এ বিষয়ে অন্যান্য বিশেষ হাদিসও রয়েছে। যা দ্বারা বোঝা যায়, তিনি ইরাকের ভূখণ্ডে শাহাদত বরণ করবেন। এমনকি কীভাবে শহিদ হবেন—তার বর্ণনাও রয়েছে। সুতরাং নববি ভবিষ্যদ্‌বাণী অনুযায়ী সমুদয় পরিস্থিতি যথাযথভাবে সংঘটিত হওয়া আমাদের নবিজির সত্যবাদিতার সবচে নির্ভরযোগ্য প্রমাণ। সেটা এ বিষয়েও প্রমাণ বহন করে যে, তিনি নিজের মনগড়া কোনো কথা বলতেন না; বরং আল্লাহ তাআলা ওহির মাধ্যমে তাঁকে যে কথা বলতে নির্দেশ দিতেন, তিনি তা-ই বলতেন।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আলি রা.-কে ওই অবস্থা ও পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত করেছেন—যা ভবিষ্যতে সংঘটিত হবে। আলি রা. রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সেইসব ভবিষ্যদ্‌বাণী সত্যরূপে বিশ্বাস করেছেন। বিভিন্ন সময়ে মানুষের সাথে এসব বিষয়ে আলোচনাও

[১৯৪] সহিহ মুসলিম : ৪/১৮৮০।

করতেন। একবার ইরাকে এ-সংক্রান্ত আলোচনা করছিলেন। আবুল আসওয়াদ দুয়ালি সেটা বর্ণনা করেন এভাবে :

আমি আলি রা.-কে বলতে শুনেছি—আমি সফরের জন্য সওয়ারির রিকাব হাতে নিলাম। এমন সময়ে আবদুল্লাহ ইবনে সালাম আমার কাছে এলেন। তিনি আমাকে বলতে লাগলেন, 'কোথায় যাচ্ছেন'? আমি বললাম, 'ইরাকে'। তিনি বললেন, 'আপনি কি দোধারি তরবারির আঘাতে কেটে পড়ার জন্য সেখানে যাচ্ছেন'? আলি রা. বললেন, 'আল্লাহর শপথ! আপনার পূর্বে আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে একথা বলতে শুনেছি'।

আবুল আসওয়াদ বলেন, একথা শুনে আমি বিস্ময়বোধ করতে লাগলাম। মনে মনে বললাম—এ-তো দুর্ধর্ষ যোদ্ধা। নিজের ব্যাপারে এমন কথা বলে যাচ্ছে![১৯৫]

তিনি খেলাফতের দায়িত্বে অধিষ্ঠিত হওয়ার পূর্বে ইয়ানবা এলাকায় আবু ফুজালাহ আনসারির সাথে এ ধরনের আলোচনা করেছিলেন। তখন আবু ফুজালাহ আলি রা.-এর রোগের অবস্থা দেখতে গিয়েছিলেন। তিনি তখন বলেছিলেন—আমি এই রোগে বা এই কষ্টে মারা যাব না। আমার ব্যাপারে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিশ্চয়তা দিয়ে বলেছেন, 'আমি ততক্ষণ পর্যন্ত মারা যাব না, যতক্ষণ পর্যন্ত এই দাড়ি মাথার রক্তে রঞ্জিত না হবে।'[১৯৬]

খারেজিদেরও তিনি একথা বলেছেন। সাধারণ সাথিদেরও বলেছেন। ইমাম বায়হাকি রাহ. তাঁর *দালাইলুন নুবুওয়াহ* গ্রন্থে এ-সংক্রান্ত হাদিসসমূহ একত্র করেছেন।[১৯৭] অনুরূপভাবে হাফেজ ইবনে কাসির রাহ.-ও *আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া* গ্রন্থে এসব বর্ণনা জমা করেছেন।[১৯৮]

আবদুল্লাহ ইবনে দাউদ আমাশের সূত্রে তিনি সালামাহ ইবনে সুহাইল হতে, তিনি সালিম ইবনে আবি জাদাহ হতে, তিনি আবদুল্লাহ ইবনে সাবা হতে

---

[১৯৫] জাহাবি প্রণীত *তারিখুল ইসলাম আহদিল খুলাফাইর রাশিদিন* : ৬৪৮।

[১৯৬] *খিলাফাতু আলি বিন আবি তালিব* : ৪৩১।

[১৯৭] *দালাইলুন নুবুওয়াহ* : ৬/৪৩৮-৪৪১।

[১৯৮] *আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া* : ৭/৩২৩-৩২৫।

বর্ণনা করেন; আবদুল্লাহ ইবনে সাবা বলেছেন, আমি আলি রা.-কে মিম্বরে বলতে শুনেছি—'আমি কেবল একজন বদবখতের অপেক্ষায় আছি। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে নিশ্চিত করেছেন, এই (দাড়ি) তার (মাথার) রক্তে রঞ্জিত হবে।' লোকেরা বলল, 'হে আমিরুল মুমিনিন, আমাদেরকে ওই হন্তারকের পরিচয় দিন। আমরা তার গোটা গোষ্ঠীসহ সমূলে উৎপাটন করব।' আলি রা. বললেন, 'আল্লাহর পানাহ! আমি চাই না আমার কারণে আমার খুনি ছাড়া অন্য একজন লোককেও অন্যায়ভাবে হত্যা করা হোক।'[১৯৯] অতঃপর তিনি এই কবিতা আবৃত্তি করেন,

أَشْدُد حيازَيمكَ لِلمَوتِ * فَإِنَّ المَوتَ لاقيكا

وَلا تَجزَع مِنَ القتل *إِذا حَلَّ بِواديكا

'মৃত্যুর অভ্যর্থনার প্রস্তুতি নাও। সে অবশ্যই তোমাদের কাছে এসে পৌঁছবে। মৃত্যু যখন তোমার উঠানে পা বাড়াবে তখন তাকে ভয় পাবে না।'[২০০]

কোনো কোনো বর্ণনায় এরচে অধিক স্পষ্ট ভাষ্য এসেছে। যার সারকথা—আলি রা. তাঁর হন্তারক সম্পর্কে জানতেন। উবায়দা আসসালামানি বিশুদ্ধ সূত্রে বর্ণনা করে বলেন, আলি রা. যখন ইবনে মুলজিমকে দেখতেন, তখন তিনি এই কবিতা আবৃত্তি করতেন,

أريد حياته ويريد قتلي * عذيرك من خليلك من مرادى

'আমি চাই সে বেঁচে থাকুক, আর সে আমাকে হত্যা করতে চায়। মুরাদ গোত্রের তোমার বন্ধুর কাছ থেকে কে তোমাকে ন্যায়বিচার এনে দেবে?'[২০১]

অন্য এক বর্ণনায় এসেছে; আলি রা. আবদুল্লাহ ইবনে মুলজিমের ব্যাপারে বলেছেন, 'এই লোক আমার খুনি।' আলি রা.-কে বলা হলো, 'তাহলে এই লোককে শাস্তি দিতে কোন বস্তু আপনাকে বিরত রেখেছে?' জবাবে তিনি বললেন, 'কিন্তু এখনও তো সে আমাকে হত্যা করেনি।'[২০২]

---

[১৯৯] আজিরি প্রণীত *কিতাবুশ শারিয়াহ* : ৪/২১০৫।
[২০০] জাহাবি প্রণীত *তারিখুল ইসলাম আহদিল খুলাফাইর রাশিদিন* : ৬৪৮।
[২০১] *তাবাকাতে ইবনে সাআদ* : ৩/৩৪, ৩৩ [সনদ বিশুদ্ধ]।
[২০২] *আল ইসতিয়াব* : ৩/১২৭।

তিনি যখন লোকদের বললেন, 'আমাকে হত্যা করা হবে'—তখন সবাই তাঁকে পরবর্তী খলিফা মনোনয়নের অনুরোধ জানান। কিন্তু আলি রা. এমনটি করতে অপারগতা প্রকাশ করেন। আবদুল্লাহ ইবনে সাবা থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন, আমি শুনেছি আলি রা. বলতেন—'এটা (মাথা) এটাকে (দাড়ি) রঞ্জিত করবে। কাজেই হতভাগ্য ব্যক্তিটি আমার ব্যাপারে অপেক্ষা করছে কেন?' লোকজন বলল, 'হে আমিরুল মুমিনিন, কে সে ব্যক্তি—আমাদের জানান, আমরা তাকে হত্যা করে ফেলি।' আলি রা. বললেন, 'আল্লাহর কসম! তাহলে তো আমাকে যে হত্যা করেনি তাকে হত্যা করা হবে।' তারা বলল, 'তাহলে আমাদের জন্যে একজন আমির নির্বাচন করুন।' আলি বললেন, 'না, বরং আমি তোমাদেরকে সেভাবে রেখে যাব যেভাবে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রেখে গেছেন।' তারা বলল, 'তাহলে আপনি আপনার প্রতিপালকের কাছে গিয়ে কী উত্তর দেবেন?' তিনি বললেন, 'আমি বলব—হে আল্লাহ! আপনার যতদিন খুশি ততদিন আমাকে তাদের মাঝে রেখেছেন। এরপর আমাকে আপনার নিকটে নিয়ে এসেছেন। আর আপনি তাদের মাঝে বিরাজমান। এখন আপনি চাইলে তাদের কল্যাণ করুন, চাইলে অকল্যাণ করুন।'[২০৩]

হজরত আলি রা. হতে বর্ণিত; তিনি বলেন, আমি মহা সত্যবাদী রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি—

إِنَّكَ سَتُضْرَبُ ضَرْبَةً هَاهُنَا ، وَضَرْبَةً هَاهُنَا ، وَأَشَارَ إِلَى صُدْغَيْهِ ، فَيَسِيلُ دَمُهَا حَتَّى يَخْضِبَ لِحْيَتَكَ ، وَيَكُونُ صَاحِبُهَا أَشْقَاهَا كَمَا كَانَ عَاقِرُ النَّاقَةِ أَشْقَى ثَمُودَ

'তোমাকে এই স্থানে আঘাত করা হবে। একথা বলার সময় তিনি মাথার তালুর দিকে ইঙ্গিত করেন এবং বলেন "এটা" "এটা"কে রঞ্জিত করবে। অর্থাৎ, মাথার রক্তে দাড়ি রঞ্জিত করবে। আঘাতকারী এমনভাবে সবচে নিকৃষ্ট লোক হবে, যেভাবে উষ্ট্রীর পা কর্তনকারী সামুদ জাতি সবচে নিকৃষ্ট জাতি ছিল।'[২০৪]

---

[২০৩] *মুসনাদে আহমাদ ইবনে হাম্বল, আল মাউসুআতুল হাদিসিয়া* : ২/৩২৫ [হাসান লিগাইরিহি]।
[২০৪] *খাসায়িসু আমিরিল মুমিনিন আলি বিন আবি তালিব* : ১৬৩, ১৬৪।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

আলি রা.-এর শাহাদত হতে প্রাপ্ত শিক্ষা ও তাৎপর্য

নাহরাওয়ান যুদ্ধে খারেজিদের পরাজয় তাদের হৃদয়ে এত গভীর ক্ষতের সৃষ্টি করে যে, সেই যন্ত্রণাদগ্ধ স্মৃতি দিবানিশি তাদের তাড়িত করে তোলে। ফলশ্রুতিতে যাদের আত্মীয়-স্বজন নাহরাওয়ান যুদ্ধে নিহত হয়েছে তাদের মধ্যে এমন একটি দল ঐক্যবদ্ধ হয়, যারা হজরত আলি রা.-কে এই পৃথিবী থেকে চিরবিদায় জানিয়ে তাদের বিপ্লব ও বিদ্রোহের পালে হাওয়া দিতে বদ্ধপরিকর হয়ে ওঠে। সকল ইতিহাসবিদ ও জীবনীকারক এ ব্যাপারে প্রসিদ্ধ বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন। বাহ্যত সবগুলোকে একরকমই মনে হয়।[২০৫] অথচ কিছু বিপরীতধর্মী ও সাংঘর্ষিক উক্তি থাকার কারণে সেসব বর্ণনায় আপত্তি তোলার যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে। এটাও অস্বাভাবিক কিছু নয় যে, অন্যান্য ঘটনার মতো এই গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাও বিভিন্ন সময়ে মনগড়া বাড়াবাড়ির শিকার হয়েছে। হ্যাঁ, মৌলিক সূত্র ও বিশ্লেষণের নিরিখে এটা সর্বসম্মতভাবে অবশ্যই প্রমাণিত যে, নাহরাওয়ানে নিহত খারেজিদের প্রতিশোধ নিতে গিয়ে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ খারেজিদের হাতে আলি রা. শহিদ হন। তবে ঘটনার পরম্পরায় 'কিতাম' নামীয় এক মহিলা ও ইবনে মুলজিমের মাঝে প্রেমের সম্পর্ক বা আশআস কিন্দি সম্পর্কে যেসব কথা বিবৃত হয়েছে, সেগুলো মেনে নেওয়া এবং বিশ্বাস করা মুশকিল। এখন আমরা আমিরুল মুমিনিন হজরত আলি রা.-এর শাহাদতের ঘটনার ওপর সবিস্তার আলোচনা করব।

এক. ষড়যন্ত্রকারীদের বৈঠক

ইবনে মুলজিম ও তার সঙ্গীদের ভাষ্য; ইবনে মুলজিম, বারাক বিন আবদুল্লাহ এবং আমর বিন বকর তামিমি—এরা তিনজন একত্রিত হয়ে নাহরাওয়ানে

[২০৫] *তাবাকাতে ইবনে সাআদ* : ৩/৩৫; *তারিখে তাবারি* : ৬/৫৮-৬৬; *মাজমাউজ জাওয়ায়িদ* : ৬/২৪৯; জাহাবি প্রণীত *তারিখুল ইসলাম* : ৬৪৯; *আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া* : ৭/৩২৫।

আলির হাতে তাদের ভাইদের নিহত হওয়ার ঘটনা আলোচনা করে অনুশোচনা ব্যক্ত করে বলে—'এরাই যখন মারা গেল, তখন আমাদের বেঁচে থাকার সার্থকতা কী? তারা তো আল্লাহর সন্তুষ্টির পথে কোনো নিন্দুকের নিন্দার ভয় করত না। আমরা যদি জীবনের ঝুঁকি নিয়ে এসব পথভ্রষ্ট নেতাদের (শাসকদের) হত্যা করি, তাহলে সারা দেশের মানুষ এদের জুলুম থেকে মুক্তি পাবে। তেমনি আমাদের নিহত ভাইদের প্রতিশোধও গ্রহণ করা হবে।' তখন ইবনে মুলজিম বলল, 'আমি আলি ইবনে আবু তালিবের দায়িত্ব নিলাম।' বারাক বলল, 'আমি মুআবিয়ার দায়িত্ব নিলাম।' আমর ইবনে বকর বলল, 'আমি আমর ইবনে আসের দায়িত্ব নিলাম।'

এরপর তিনজন শপথের মাধ্যমে অঙ্গীকার করল—প্রত্যেকেই নিজ নিজ দায়িত্বের লোককে হত্যা করা থেকে ক্ষান্ত হবে না। হয় তার শত্রুকে হত্যা করবে, না-হয় নিজে নিহত হবে। এরপর তারা নিজ নিজ তরবারিতে বিষ সংযোগ করল এবং হত্যাকাণ্ড ঘটাবার জন্য রমজানের ১৭ তারিখ দিন ধার্য করল। যে যাঁকে হত্যা করার দায়িত্ব নিল, তিনি যে শহরে থাকেন সেদিকে তারা রওনা হয়ে গেল।[২০৬]

দুই. ইবনে মুলজিমের যাত্রা ও কিতাম বিনতে শাজানাহের সাক্ষাৎ

ইবনে মুলজিম আলমুরাদির সম্পর্ক যেহেতু বনু কিন্দার সাথে, তাই সে কুফা গিয়ে পৌঁছল। সে তার উদ্দেশ্য গোপন রেখে অবস্থান করতে থাকে। কুফায় তার নিজ সম্প্রদায়ের যেসব খারেজি বসবাস করত তাদের কাছেও সে তার উদ্দেশ্য গোপন রাখে। একদিন বনু রাবাবের কতিপয় লোকের এক বৈঠকে ইবনে মুলজিম বসে আছে। বৈঠকে তারা নাহরাওয়ানের যুদ্ধে নিজেদের নিহত ব্যক্তিদের স্মরণে আলোচনা করছিল। একপর্যায়ে ওই গোত্রের এক মহিলা সেখানে উপস্থিত হয়। মহিলার নাম কিতাম বিনতে শাজানাহ। নাহরাওয়ানে তার পিতা ও ভাই আলি রা.-এর হাতে নিহত হয়।

মহিলাটি ছিল সে যুগের এক অপ্রতিদ্বন্দ্বী অনিন্দ্যসুন্দরী। সারাক্ষণ মসজিদে ইবাদত-বন্দেগিতে নিমগ্ন থাকত। মহিলার ওপর দৃষ্টি পড়তে তার সৌন্দর্য-দর্শনে ইবনে মুলজিম আত্মহারা হয়ে যায়। এমনকি তার আগমনের উদ্দেশ্য সম্পর্কেই সে বিস্মৃত হয়ে পড়ে।

---

[২০৬] *তারিখে তাবারি* : ৬/৫৬।

অবশেষে সে মহিলাকে বিয়ের প্রস্তাব দেয়। মহিলা ৩ হাজার দিরহাম, একজন খাদেম, একজন দাসী ও আলি ইবনে আবু তালিবকে হত্যার শর্তে প্রস্তাবে সম্মত হয়। ইবনে মুলজিম সকল শর্ত মেনে নেয়। প্রথম তিনটি তখনই আদায় করে এবং শেষেরটি সম্পর্কে জানায়—আমি এ শহরে কেবল আলিকে হত্যা করার উদ্দেশ্যেই এসেছি।

উভয়ের মধ্যে বিয়ে হয়ে যায়। তারা একত্রে বসবাস করে। মহিলা আলির হত্যা ত্বরান্বিত করতে ইবনে মুলজিমকে উত্তেজিত করতে থাকে। সে তার নিজের রাবাব গোত্রের ওয়ারদান নামক এক ব্যক্তিকে আলি রা.-কে হত্যা কাজে সহযোগী হিসেবে ইবনে মুলজিমের সাথি বানিয়ে দেয়।

ইবনে মুলজিম শাবিব ইবনে বাজরা নামক আরেক ব্যক্তিকে তার কাজে সহযোগী বানাবার চেষ্টা করে। ইবনে মুলজিম তার কাছে গিয়ে বলে—'তুমি কি দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ লাভ করতে চাও?' সে বলল, 'কীভাবে?' ইবনে মুলজিম বলল, 'আলিকে হত্যা করতে হবে।' শাবিব বলল, 'তোমার মা তোমাকে হারিয়ে ফেলুক! তুমি তো এক বীভৎস কাজের পরিকল্পনা নিয়ে এসেছ। আচ্ছা, কীভাবে তাকে হত্যা করবে—বলো।' ইবনে মুলজিম বলল, 'আমি মসজিদে লুকিয়ে থাকব। তিনি যখন ফজরের নামাজে আসবেন তখন তাকে আঘাত হানব ও হত্যা করব। এরপর যদি বেঁচে যাই তাহলে তো অন্তরে তৃপ্তি বোধ করলাম ও প্রতিশোধ গ্রহণে সক্ষম হলাম। আর যদি মারা পড়ি তাহলে আল্লাহর কাছে যে প্রতিদান পাব, তা দুনিয়ার থেকে বহুগুণে উত্তম।'

শাবিব বলল, 'তোমার সর্বনাশ হোক! যদি আলি ব্যতীত অন্য কেউ হতো তাহলে আমার কাছে সহজ লাগত। তুমি তো জানো যে, আলি রা. হচ্ছেন প্রথম সময়ে ইসলাম গ্রহণকারীদের অন্যতম। তিনি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়। তাঁকে হত্যা করতে আমি অন্তরের সাড়া পাচ্ছি না।'

ইবন মুলজিম বলল, 'তোমার কি জানা নেই—নাহরাওয়ানে আলি আমাদের লোকদের হত্যা করেছেন?' শাবিব বলল, 'হ্যাঁ, তা করেছেন।' ইবনে মুলজিম বলল, 'তাহলে আমাদের যেসব ভাইদের তিনি হত্যা করেছেন তার পরিবর্তে আমরা তাকে হত্যা করব।' কিছুক্ষণ চুপ থাকার পর শাবিব ইবনে মুলজিমের প্রস্তাবে সম্মতি প্রদান করল।

এরপর উভয়ে কিতামের কাছে আসে। সে সেখানকার জামে মসজিদে এতেকাফে বসেছিল। তারা উভয়ে তাকে বলল, 'আমরা আলিকে হত্যার ব্যাপারে একমত হয়েছি।' কিতাম বলল, 'ঠিক আছে। যেদিন তোমরা কার্যসিদ্ধি করবে সেদিন আমার কাছে আসবে।' পরে যে জুমআর রাতে আলি রা. শহিদ হন, সেদিন ইবনে মুলজিম কিতামের কাছে পুনরায় আসে।

এটা ৪০ হিজরির ঘটনা। কিতাম একটি রেশমি কাপড়ে টুকরো চাইল। সেটা তার মাথায় বেঁধে দিলো। তখন ইবনে মুলজিম তার সাথিদেরকে ১৭ রমজান শুক্রবার রাতে হামলা চালাবার কথা জানিয়ে দিলো। তাদেরকে সে আরও জানাল—'আমার আরও দুই সঙ্গী আছে যারা এই একই সময়ে মুআবিয়া ও আমর ইবনে আসের ওপর হামলা করবে।'

নির্ধারিত সময়ে তারা তিনজন; অর্থাৎ, ইবনে মুলজিম, ওয়ারদান ও শাবিব তরবারি সজ্জিত হয়ে মসজিদের যেই দরজা দিয়ে আলি রা. বের হন সেই দরজার কাছে গিয়ে অবস্থান নেয়। কিছুক্ষণের মধ্যে আলি রা. তাঁর কক্ষ থেকে বেরিয়ে মসজিদে রওনা হন। আসার পথে লোকদের ঘুম থেকে জাগাবার জন্য 'আসসালাত আসসালাত' শব্দে আহ্বান করেন। মসজিদে প্রবেশকালে প্রথমে শাবিব তার তলোয়ার দিয়ে আঘাত করে। কিন্তু সেই আঘাত আলি রা.-এর গায়ে না লেগে মসজিদের প্রাচীরে তাকের উপর লাগে। এরপর ইবনে মুলজিম আলির মাথার উপরিভাগে আঘাত করে। তখন আলি রা.-এর মস্তক থেকে রক্ত প্রবাহিত হয়ে দাড়ি ভিজে যেতে থাকে।

ওয়ারদান পালিয়ে যাবার সময় লোকেরা তাকে ধরে হত্যা করে ফেলে। শাবিব কিন্দার বসতির দিকে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। চারদিকে শুরু হয়ে যায় চিৎকার-হাঙ্গামা। এ সময়ে হাজরামাওতের এক লোক; যার নাম উয়াইমির—সে শাবিবকে ধাওয়া করে। তার হাত থেকে তরবারি ছিনিয়ে নিয়ে তাকে মাটিতে ফেলে দেয়। কিন্তু সে যখন দেখল লোকজন খুনি ওয়ারদানকে তালাশ করছে আর তার তরবারি আমার হাতে, তখন উয়াইমির ভীত হয়ে পড়ল। সে ভাবল; না জানি লোকেরা আমাকে খুনি মনে করে হত্যা করে ফেলে। তাই সে তাকে ছেড়ে দেয়। শাবিব সুযোগ পেয়ে জনসমাগমে ঢুকে যায়। লোকেরা চেষ্টা করেও তাকে আর ধরতে পারেনি।

ইবনে মুলজিম ধৃত হয়। তাকে ঘাড়মোড়া করে বাঁধা হয়। আবু দিমা উপনাম-বিশিষ্ট হামদান গোত্রের এক লোক তার তরবারি ছিনিয়ে নিয়ে ইবনে মুলজিমের পায়ে আঘাত করে; ফলে সে মাটিতে পড়ে যায়। নামাজে ইমামতি করার জন্য আলি রা. জাদা ইবনে হুবাইরা ইবনে আবু ওহাবকে নির্দেশ দেন। তিনি ফজরের নামাজে ইমামতি করেন। আলিকে তাঁর গৃহে নিয়ে যাওয়া হয়। এরপর আবদুর রহমান ইবনে মুলজিমকে ঘাড়মোড়া অবস্থায় তার সামনে হাজির করা হয়।

আলি রা. বললেন, 'হে আল্লাহর দুশমন, আমি কি তোমার সাথে উত্তম ব্যবহার করিনি?' সে বলল, 'হ্যাঁ।' আলি বললেন, 'তুমি এ কাজ কেন করলে?' সে কোনো জবাব দিলো না। অবশ্য সে বলেছে—'আমি ৪০ দিন যাবৎ এ তরবাবি ধার দিয়েছি এবং আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করেছি; যেন সৃষ্টিজগতের সবচে নিকৃষ্ট লোক এ তরবারির আঘাতে হত হয়।' আলি রা. বললেন, 'আমি দেখছি এর দ্বারা তোমাকে হত্যা করা হবে এবং তুমিই হবে সৃষ্টিজগতের নিকৃষ্টতম লোক।'[২০৭]

তিন. মুহাম্মাদ বিন হানাফিয়ার ভাষ্যে আলি রা.-এর শাহাদত

ইবনুল হানাফিয়া বলেন, আমিও ওই রাতে লোকজনের সাথে জামে মসজিদে নামাজ পড়েছি। নামাজে এত অধিক পরিমাণ লোক অংশগ্রহণ করে যে, দরজার কাছেও অনেকের নামাজ পড়তে হয়েছে। কেউ ছিল কিয়ামে, কেউ রুকুতে, কেউ সেজদায়। সারারাত তাঁরা ইবাদত ও নামাজ পড়ে ক্লান্ত হতো না। সে রাত ভোরবেলা আলি রা. ফজর নামাজের জন্য বের হন। আসার পথে লোকদের ঘুম থেকে জাগাবার জন্য 'আসসালাত আসসালাত' শব্দে আহ্বান করেন। মসিজদে প্রবেশকালে তিনি একটি আলোকরশ্মি দেখতে পান এবং এই আওয়াজ শুনেন— الحكم لله يا علي لا لك ولا لأصحابك، فرأيت سيفا 'আল্লাহ ছাড়া কারও হুকুম করার অধিকার নেই। হে আলি, তোমারও নেই এবং তোমার অনুসারীদেরও নেই।' এরপর আমি একটি তরবারি দেখলাম। এবং সাথে সাথে আরেকটি তরবারির ওপর আমার দৃষ্টি পড়ল। এরপর আলি রা.-কে বলতে শুনলাম—'এই লোক যেন পালিয়ে যেতে না পারে।' লোকজন চারদিক দিয়ে তাকে ঘিরে রাখল। সে আর পালাতে পারল

[২০৭] তারিখে তাবারি : ৬/৬২।

না। ধরা পড়ল। তাকে আলি রা.-এর সামনে পেশ করা হলো। লোকদের সাথে আমিও তার কাছে গেলাম। এরপর আলি রা. সবাইকে লক্ষ্য করে বললেন, 'আমি যদি মারা যাই, তবে কিসাস হিসেবে তাকে হত্যা করবে। আর যদি বেঁচে যাই তাহলে আমিই সিদ্ধান্ত নেব তার ব্যাপারে কী করা যায়।'[২০৮]

মুহাম্মাদ বিন হানাফিয়া বলেন, এরপর লোকেরা হতচকিত হয়ে হাসান রা.-এর কাছে গেল। ইবনে মুলজিমকে সেসময় একটি মশকের সাথে বেঁধে রাখা হয়েছিল। ইবনে কুলসুম বিনতে আলি রা. তাঁর পিতার অবস্থা দেখে কাঁদছিলেন। তিনি ইবনে মুলজিমকে বললেন, 'হে আল্লাহর দুশমন, আমার আব্বার কোনো ক্ষতি হবে না। আল্লাহ তোকেই অপদস্থ করবেন।' ইবনে মুলজিম বলল, 'তাহলে তুমি কাঁদছ কেন? এই তরবারিটি আমি ১ হাজার দিরহাদ দিয়ে ক্রয় করেছি। আরও ১ হাজার দিরহাম দিয়ে একে বিষমিশ্রিত করেছি। এর একটি আঘাত যদি গোটা শহরবাসীকে মারা হয়, তবে কেউই বেঁচে থাকবে না।'[২০৯]

চার. চিকিৎসককে আলি রা.-এর উপদেশ এবং শুরার আগ্রহ

আবদুল্লাহ ইবনে মালিক বলেন, যেদিন আমিরুল মুমিনিন হজরত আলি রা. আঘাতপ্রাপ্ত হন, সেদিন ক'জন চিকিৎসককে ডেকে আনা হয়। তন্মধ্যে আসির বিন আমর আসসাকুনি ছিলেন অত্যন্ত দক্ষ চিকিৎসক। কিসরার সম্রাটও তাঁর কাছ থেকে চিকিৎসা নিত। চিকিৎসার উদ্দেশ্যে সে ছাগলের গরম ফুসফুস নেয়। সেখান থেকে বিশেষ একটি রগ বের করে আলি রা.-এর ক্ষতস্থানে রাখে। এরপর তাতে ফুঁ দেয় এবং বাইরে বের করে। দেখা গেল তাতে মস্তিষ্কের সাদা আবরণ লেগে আছে। তার মানে, তরবারির আঘাত মস্তিষ্কের গভীরে গিয়ে পৌঁছেছে। এরপর চিকিৎসক বললেন, 'আপনি এখন নিজের কাজ সেরে ফেলুন। আর প্রাণে বাঁচা সম্ভব নয়।'[২১০]

আবদুল্লাহ বলেন, এ সময় জুনদুব ইবনে আবদুল্লাহ আলি রা.-কে জিজ্ঞেস করেন, 'আপনার যদি মৃত্যু হয়ে যায়, তাহলে আমরা কি হাসানের নিকট

---

[২০৮] *তারিখে তাবারি : ৬/৬২।*
[২০৯] *তারিখে তাবারি : ৬/৬২।*
[২১০] *আল ইসতিয়াব : ৩/১১২৮।*

বায়আত গ্রহণ করব?' তিনি বললেন, 'আমি তোমাদেরকে আদেশও করছি না, নিষেধও করছি না। এ ব্যাপারে কী করবে তোমরাই ভালো জানো।'[২১১]

পাঁচ. হাসান ও হুসাইন রা.-কে আলি রা.-এর উপদেশ

এরপর তিনি তাঁর দুই ছেলে হাসান ও হুসাইনকে ডাকলেন। তাঁদের উদ্দেশ করে বললেন, 'আমি তোমাদের কিছু অসিয়ত করতে চাই। আল্লাহকে ভয় করবে। দুনিয়ায় মন লাগাবে না; যদিও সে তোমাদের পিছু লেগে থাকে। পাওয়ার মতো নয় এমন কোনো বস্তুর জন্য আক্ষেপ করবে না। সত্য কথা বলবে। এতিমের ওপর দয়া করবে। অসহায়কে সাহায্য করবে। নিজের পরকালকে সাজাবার চেষ্টা করবে। জালেমকে তার জুলম হতে বাধা দেবে। আল্লাহর কিতাবমতে আমল করবে। তাঁর বিধান পালন করতে গিয়ে কোনো তিরস্কারকারীর তিরস্কার পাত্তা দেবে না।'

এরপর তিনি তার তৃতীয় ছেলে মুহাম্মাদ বিন হানাফিয়ার দিকে ফিরে বললেন, 'আমি তোমার দুই ভাইকে যে উপদেশ দিয়েছি তুমি কি তা ভালো করে শুনতে পেয়েছ?'[২১২]

তিনি বললেন, 'জি হ্যাঁ।' আলি রা. বললেন, 'তুমি তোমার বড় ভাইদের শ্রদ্ধা করবে। কেননা, তোমার ওপর তাদের অনেক হক আছে। তারা যা বলবে তদানুযায়ী আমল করবে। তাদের নির্দেশ মান্য করতে বিলম্ব করবে না।'

এরপর তিনি হাসান ও হুসাইনকে ডেকে আবার উপদেশ দিয়ে বলেন, 'আমি তাঁর (মুহাম্মাদ বিন হানাফিয়া) ব্যাপারে তোমাদের কল্যাণকামিতার উপদেশ দিচ্ছি। কেননা, সে-ও তোমাদের পিতার সন্তান। তোমরা তো জানো, তাঁর পিতা তাঁকে কী পরিমাণ স্নেহ করে।'

অতঃপর হাসান রা.-এর দিকে ফিরে তিনি বলেন, 'হে আমার ছেলে, সকল ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করে চলবে। নামাজ কায়েম করবে। জাকাত আদায় করবে। ক্রোধ নিবারণ করবে। আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখবে। মূর্খদের ব্যাপারে ধৈর্যধারণ করবে। দীনের গভীর জ্ঞান অর্জন করবে। দৃঢ়তার সাথে কাজ করবে। কুরআনের হেফাজত করবে। প্রতিবেশীর সাথে উত্তম ব্যবহার

---

[২১১] তারিখে তাবারি : ৬/৬২।
[২১২] তারিখে তাবারি : ৬/৬৩।

করবে। ভালো কাজের আদেশ ও মন্দ কাজের নিষেধ করবে। নির্লজ্জতা থেকে দূরে থাকবে।'[২১৩]

মৃত্যু একেবারে নিকটবর্তী হলে তিনি অসিয়ত করে বলেন,

'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম।

এটা আলি ইবনে আবু তালিবের অসিয়ত। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই। তিনি একক, তাঁর কোনো শরিক নেই। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, হজরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর বান্দা ও রাসুল। তিনি তাঁকে হেদায়াত ও দীনে হকসহ পাঠিয়েছেন; যাতে অন্যান্য সকল দীনের ওপর একে বিজয়ী করতে পারেন। যদিও মুশরিকরা তা অপছন্দ করে। আমার নামাজ, আমার কুরবানি, আমার জীবন, আমার মরণ আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের জন্যে নিবেদিত। তাঁর কোনো শরিক নেই—এটা বলার জন্য আমি আদিষ্ট হয়েছি এবং আমি একজন মুসলিম।

হে হাসান, আমি তোমাকে, আমার সকল সন্তানকে ও যাদের কাছে আমার এ অসিয়তলিপি পৌঁছবে, সকলের কাছে আমার এ উপদেশ রইল—তোমরা সবাই আল্লাহকে ভয় করে চলবে। খাঁটি মুসলমান না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না। সকলে মিলে আল্লাহর রজ্জুকে শক্তভাবে ধারণ করো। ছিন্নভিন্ন হয়ে থেকো না। আমি আবুল কাসিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি—"সালাত ও সিয়ামের ব্যাপকতার তুলনায় নিজেদের মধ্যে ঐক্য ও সুসম্পর্কের গুরুত্ব অনেক বেশি।" তোমরা রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয়দের অধিকারের প্রতি যত্নবান থেকো। তাঁদের অধিকার প্রদানপূর্বক সম্পর্ক রক্ষা করিয়ো। আল্লাহ তোমাদের হিসাব সহজ করে নেবেন। এতিমদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করো। তাঁদের খোরাক বন্ধ করো না। তোমরা বেঁচে থাকতে যেন তাঁরা ধ্বংস হয়ে না যায়। প্রতিবেশীর অধিকারের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করো। কেননা, তাঁদের অধিকারের ব্যাপারে তোমাদের নবির অসিয়ত রয়েছে। তিনি প্রতিবেশীর ব্যাপারে সর্বদা অসিয়ত করতেন। এমনকি আমাদের মনে হতে লাগল যে, হয়তো তিনি প্রতিবেশীকেও ওয়ারিসদের অন্তর্ভুক্ত করে দেবেন।

[২১৩] *তারিখে তাবারি* : ৬/৬৩।

পবিত্র কুরআনের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করো। এমন যেন না হয় যে, কুরআন অনুসরণে অন্যরা তোমাদের চেয়ে এগিয়ে যাবে। সালাতের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করো। কারণ, সালাত হচ্ছে দীনের স্তম্ভ। তোমাদের প্রতিপালকের ঘর সম্পর্কে আল্লাহকে ভয় করো। যতদিন জীবিত থাকো, তোমাদের থেকে যেন তা খালি না হয়। যদি তা ত্যাগ করা হয়, তা হলে পরস্পর বিতর্ক করো না। রমজান মাসের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করো। কেননা, এ মাসের সিয়াম জাহান্নামের আগুন থেকে ঢালস্বরূপ। আল্লাহর পথে জান-মাল দিয়ে জিহাদ করার ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করো।

জাকাতের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করো। কেননা, জাকাত আল্লাহর ক্রোধকে নির্বাপিত করে। তোমাদের নবির জিম্মিদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করো। তোমাদের সম্মুখে যেন তাদের ওপর অত্যাচার না হয়। তোমাদের নবির সাহাবিগণের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করো। কেননা, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁদের সম্পর্কে সংযত থাকতে নির্দেশ দিয়েছেন।

ফকির ও মিসকিনদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করো। তাঁদেরকে তোমাদের সমাজের অন্তর্ভুক্ত করে রেখো। তোমাদের অধীনস্থ দাস-দাসীদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করো। কেননা, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জীবনের সর্বশেষ উপদেশ দিতে গিয়ে তিনি বলেছিলেন—"আমি দুই শ্রেণির দুর্বলদের ব্যাপারে সদয় হতে তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছি। তারা হলো নারী ও দাস-দাসী।" সালাত, সালাত; আল্লাহর ব্যাপারে কোনো নিন্দুকের নিন্দার পরোয়া করো না। এ মনোভাব তোমাদেরকে তাদের ক্ষতি থেকে রক্ষা করবে, যারা তোমাদের আক্রমণ করতে চায় কিংবা যারা তোমাদের ওপর বিদ্রোহ করতে চায়। মানুষের সাথে সদালাপ করো। মহান আল্লাহ তোমাদেরকে সে আদেশই করেছেন। সৎ কাজে আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ করা ত্যাগ করো না। যদি এ নীতি অবলম্বন করো, তাহলে নিকৃষ্ট লোকদের হাতে নেতৃত্ব চলে যাবে। তখন তোমরা দুআ করবে; কিন্তু সে দুআ কবুল হবে না। পারস্পরিক সম্পর্ক রক্ষা করবে এবং একে অপরের জন্যে অর্থ-সম্পদ ব্যয় করবে। কারও দোষ-ত্রুটি অন্বেষণ করা, সম্পর্ক ছিন্ন করা ও অনৈক্য সৃষ্টি করা থেকে সাবধান

থাকবে। ভালো কাজে ও তাকওয়ামূলক কাজে একে অপরের সহযোগিতা করো।

পাপ কাজে ও সীমালঙ্ঘনমূলক কাজে কারও সহযোগিতা করো না। আল্লাহকে সদা-সর্বদা ভয় করিয়ো। তিনি কঠিন শাস্তি দানকারী। আহলে বাইতের কোনো ক্ষতি করা থেকে আল্লাহ তোমাদেরকে রক্ষা করুন। তোমাদের নবি (এর সুন্নাত)-কে হেফাজত করুন। আমি তোমাদেরকে মহান আল্লাহর দায়িত্বে রেখে যাচ্ছি।

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।'

এরপর তিনি কেবল 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' কালেমা পড়তে থাকেন। একপর্যায়ে তাঁর নির্ধারিত নিঃশ্বাস শেষ হয়ে যায়। সাথে সাথে পার্থিব জীবনের চির-অবসান ঘটে। তাঁর ইনতেকালের তারিখ ৪০ হিজরি সনের রমজান মাস।[২১৪]

এক বর্ণনায় এসেছে; তিনি রমজানের ২১ তারিখ ভোরে শহিদ হন।[২১৫] দুষ্কৃতিকারীর হাতে আঘাতের তিনদিন পর তিনি ইনতেকাল করেন।[২১৬]

ছয়. হত্যাকারীর চেহারা বিকৃত করতে আলি রা.-এর বাধা

তিনি তাঁর হন্তারকের ব্যাপারে বলেন, 'তাকে বন্দি করে রাখো। আমি মারা গেলে তাকে হত্যা করবে। যদি বেঁচে থাকি তবে আঘাতের বদলে কিসাস নেওয়া হবে।'[২১৭]

আরেক বর্ণনায় এসেছে; তিনি বলেছেন, 'তাকে পানাহার-সামগ্রী দাও। বন্দির ক্ষেত্রে কোমলতা গ্রহণ করো। আমি যদি সুস্থ হয়ে উঠি তাহলে নিজ খুনের ব্যাপারে আমিই দায়িত্ব নেব। চাইলে ক্ষমা করে দেবো অন্যথায় বদলা নেব।'[২১৮]

---

[২১৪] *তারিখে তাবারি* : ৬/৬৪।
[২১৫] বুখারি প্রণীত *আততারিখুল কাবির* : ১/৯৯ [সনদ বিশুদ্ধ]।
[২১৬] আবদুল হামিদ প্রণীত *খিলাফাতু আলি বিন আবি তালিব* : ৪৩০।
[২১৭] *ফাজাইলুস সাহাবাহ* : ২/৫৬০ [সনদ বিশুদ্ধ]।
[২১৮] আবদুল হামিদ প্রণীত *খিলাফাতু আলি বিন আবি তালিব* : ৪৩৯।

অন্য বর্ণনায় এটুকু বাড়তি ভাষ্য এসেছে যে, 'আমি যদি মারা যাই, তাহলে আমার হত্যার মতো তাকে হত্যা করবে। সীমা অতিক্রম করবে না। আল্লাহ তাআলা সীমালঙ্ঘনকারীকে ভালোবাসেন না।'[২১৯]

তিনি হজরত হাসান রা.-কে নিজ হন্তারকের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কর্তন ও চেহারা বিকৃতি করতে নিষেধ করতে গিয়ে বলেন, 'হে বনু আবদিল মুত্তালিব, আমি তোমাদেরকে মুসলমানদের রক্তে যেন ডুবন্ত না দেখি। "আমিরুল মুমিনিনকে হত্যা করা হয়েছে, আমিরুল মুমিনিনকে হত্যা করা হয়েছে"—এই বলে যেন তাদের হত্যা করা না হয়। সাবধান! কিছুতেই অন্য কাউকে হত্যা করা যাবে না। আর হে হাসান, তুমি শোনো। আমি যদি তার আঘাতে মারা যাই, তাহলে একটি আঘাতের পরিবর্তে তাকে একটি আঘাত করবে। খুনির চেহারা বিকৃত করবে না। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কর্তন করবে না। কেননা, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি—"কারও চেহারা ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিকৃত করবে না।"'[২২০]

স্মর্তব্য, হজরত আলি রা. তাঁর হত্যাকারীর ব্যাপারে যে অসিয়ত করেছিলেন, সে ব্যাপারে বিভিন্ন বর্ণনা রয়েছে। কিছু সহিহ কিছু জয়িফ। তন্মধ্যে একটি রেওয়ায়াত হচ্ছে—আলি রা. তাঁর হত্যাকারীকে হত্যা করার পর আগুনে পুড়িয়ে ফেলার নির্দেশ দিয়েছেন। অথচ এই বর্ণনার সনদ জয়িফ তথা দুর্বল। কেননা, অন্যান্য সব বর্ণনার মর্ম একদিকে। সেটা হচ্ছে—তিনি বলেছেন, 'আমি যদি তার আঘাতে মারা যাই, তাহলে তাকে হত্যা করবে।' এ ছাড়া অন্য কোনো প্রতিশোধমূলক পদক্ষেপ নিতে তিনি নিষেধ করেছেন। সুতরাং এই অর্থের সব বর্ণনা একটি আরেকটির সমর্থন করে। যা দ্বারা বিপরীতধর্মী বর্ণনা অসার ও অমূলক হিসেবে সাব্যস্ত হয়। এ দিকটিও বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে, আলি রা. তার হত্যাকারীকে মুরতাদ আখ্যায়িত করেননি। বেঁচে থাকাবস্থায় তাকে হত্যা করতে নির্দেশ দেননি; বরং যখন কিছু লোক তাকে হত্যা করতে চাইল, তিনি তাদের বাধা দিলেন। বললেন, 'তাকে হত্যা করবে না। আমি যদি সুস্থ হই তবে তার কাছ থেকে আঘাতের বদলায় কিসাস নেব। আর যদি মারা যাই তবে তাকে হত্যা করবে।'[২২১]

---

[২১৯] *তাবাকাতে ইবনে সাআদ* : ৩/৩৫।

[২২০] *তারিখে তাবারি* : ৬/৬৪।

[২২১] *মিনহাজুস সুন্নাহ* : ৫/২৪৫, ৭/৪০৫, ৪০৬; *মানহাজু ইবনি তাইমিয়া ফি মাসআলাতিত তাকফির* : ৩০৯।

প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক সূত্রে বর্ণিত; আলি রা. ইনতেকাল করলে হাসান রা. ইবনে মুলজিমকে তলব করেন। সে এসে হাসান রা.-কে বলল, 'আমি আপনাকে একটি কথা বলতে চাই।' হাসান রা. বললেন, 'কী কথা?' ইবনে মুলজিম বলল, 'আমি হাতিমে আল্লাহর সঙ্গে অঙ্গিকার করেছি—আলি ও মুআবিয়া উভয়কে হত্যা করব, অন্যথায় আত্মহত্যা করব। অতএব, আপনি এই শর্তে আমাকে ছেড়ে দিন যে, আমি মুআবিয়ার কাছে যাব। তাকে হত্যা করতে সক্ষম হই বা না হই; আমি বেঁচে থাকলে উভয় পরিস্থিতিতে আপনাকে কথা দিচ্ছি—আপনার কাছে ফিরে আসব। নিজেকে আপনার হাতে সোপর্দ করব।'

হাসান রা. বললেন, 'না, কখনো না—যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি নিজ চোখে আগুন দেখে না নেবে'। এরপর তিনি এগিয়ে গিয়ে তাকে হত্যা করলেন। পরে লোকজন তার গায়ে আগুন লাগিয়ে দিলো।[২২২] তবে এই বর্ণনা বিচ্ছিন্ন।[২২৩]

হাসান ও হুসাইন রা.-সহ শোকসন্তপ্ত আহলে বাইতের সম্পর্কে যে কথা বলা হয়েছে যে, তাঁরা আবদুর রহমান ইবনে মুলজিমের ব্যাপারে আমিরুল মুমিনিন আলি রা.-এর অসিয়তের ওপর কঠোরতার আশ্রয় নিয়েছেন। এটা মোটেই প্রমাণিত নয়।

আলি রা.-কে দাফনের পর ইবনে মুলজিমকে উপস্থিত করা হয়। অতঃপর সবাই সমবেত হয়। পরে তাকে পুড়িয়ে মারা হয়। মুহাম্মাদ বিন হানাফিয়া, হুসাইন ও আবদুল্লাহ ইবনে জাফর ইবনে আবি তালিব প্রমুখ বলেন, 'আমাদের ছেড়ে দিন। এটা দেখে মনটাকে খানিক শান্ত করি।'

এরপর আবদুল্লাহ তার মাথা ও পা কাটলেন। সে চিৎকার করতে লাগল। পরে তার চোখ সেলাই করলেন; কিন্তু সে কোনো সাড়াশব্দ করল না; বরং বলতে লাগল—'তোমরা তোমাদের চাচার দুচোখ সেলাই করছ।' অতঃপর সে 'সুরা আলাক'-এর প্রথম আয়াত তেলাওয়াত করল। তার দুচোখ বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়তে লাগল। সম্পূর্ণ সুরা সে তেলাওয়াত করল। অতঃপর তার জিহ্বা কর্তন করার কথা বলা হলে সে চিৎকার করতে আরম্ভ করল। তাকে জিজ্ঞেস করা হলো, 'কেন চিৎকার করছ?' জবাবে সে বলল, 'চিৎকার

---

[২২২] *তারিখে তাবারি* : ৬/৬৪।
[২২৩] আবদুল হামিদ প্রণীত *খিলাফাতু আলি বিন আবি তালিব* : ৪৪০।

করছি না; বরং আমি তো বেঁচে থাকতে একটি মুহূর্তও আল্লাহর জিকর ছাড়া কাটাতে চাই না।' পরে তার জিহ্বা কাটা হলো। অতঃপর আগুনে পুড়িয়ে ফেলা হয়। সে ছিল গোধূম বর্ণের ও উজ্জ্বল চেহারার লোক। দুই কানের লতি পর্যন্ত লম্বা চুল এবং ললাটে ছিল তার সেজদার চিহ্ন।[২২৪]

আবদুর রহমান ইবনে মুলজিমের ব্যাপারে ইমাম জাহাবি রাহ. বলেন, আলি রা.-এর খুনি ছিল এক স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের খারেজি। সে মিসর বিজয় অভিযানে অংশগ্রহণ করেছে। ওখানে সম্মানের সাথে বসবাস করেছিল। সে কুরআন পড়েছিল এবং দীনের আহকাম শিখেছিল। সে ছিল বনু ওয়াতদুলের বাসিন্দা। মিসরে ওই গোত্রের সবচে বড় অশ্বারোহী, খুবই ইবাদতগুজার এবং মুআজ বিন জাবাল রা.-এর শাগরেদ ছিল। সাবিগ তামিমিকে সে-ই উমর রা.-এর কাছে পাঠিয়েছিল। সে তার কাছে কুরআনের মুতাশাবিহাতের ব্যাপারে প্রশ্ন করে। তার ব্যাপারে বিস্তারিত বিবরণ দিয়ে তিনি বলেন—'কিন্তু শেষে তার মস্তিষ্কে বিকৃতি এসে গেল। মারাত্মক অঘটন ঘটিয়ে বসল। খারেজিরা তাকে উম্মতের সবচে উত্তম ব্যক্তি মনে করে।' ইমরান ইবনে হাতান নামক জনৈক খারেজি ইবনে মুলজিমের প্রশংসায় বলেছে—

يا ضربة من تقي ما أراد بها ** إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا

إني لأذكره يوماً فأحسبه ** أوفَى البرية عند الله ميزانا

'সেই আল্লাহভীরু লোকটির তরবারির আঘাত আমার মনে পড়ে। যেই আঘাতের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল আরশের অধিপতির সন্তুষ্টি লাভ করা। আজ আমি তাকে স্মরণ করছি এবং ভাবছি আল্লাহর নিকট তার পাল্লা সবার চেয়ে ভারি হবে।'

এদিকে রাফেজিদের মতে ইবনে মুলজিম আখেরাতে সবচে নিকৃষ্ট মাখলুক। আর আমরা আহলে সুন্নাত তার জন্য জাহান্নামের শাস্তি কামনা করি। এটাও সম্ভব বলে মনে করি যে, আল্লাহ চাইলে তাকে ক্ষমাও করতে পারেন। খারেজি ও রাফেজিরা তার সম্পর্কে যে আকিদা লালন করে, সেটা আমাদের আকিদা নয়। তার ব্যাপারেও ওই বিধান যা উসমান, জুবাইর, তালহা, সাইদ বিন জুবাইর, আম্মার, খারিজা ও হুসাইনের হত্যাকারীদের ব্যাপারে রয়েছে। এসব খুনিদের থেকে আমরা নিজেদের দায়মুক্তি প্রকাশ করছি। আল্লাহর

[২২৪] তাবাকাতে ইবনে সাআদ : ৩/৩৯।

সন্তুষ্টির লক্ষ্যে তাদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ পোষণ করি এবং তাদের ব্যাপারটি আল্লাহর হাতে সোপর্দ করি।[২২৫]

মুআবিয়া রা.-কে হত্যার দায়িত্ব নিয়েছিল বারক বিন আবদুল্লাহ। নির্ধারিত দিনে মুআবিয়া ফজরের নামাজ আদায়ের জন্য বের হলে পথে বারক তাকে তরবারি দিয়ে আঘাত করে। কেউ বলেছেন বিষযুক্ত খঞ্জর দিয়ে আঘাত করে। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে তা তার নিতম্বে লেগে সেখান থেকে কিছু অংশ কেটে যায়। লোকজন ওই খারেজিকে ধরে হত্যা করে ফেলে।

মৃত্যুর পূর্বে সে মুআবিয়াকে বলেছিল—'আমাকে ছেড়ে দিন, আমি আপনাকে একটি সুসংবাদ দেবো।' মুআবিয়া রা. বললেন, 'কী সে সুসংবাদ?' সে বলল, 'আমার আরেক ভাই আজ আলি ইবনে আবু তালিবকে হত্যা করেছে।' মুআবিয়া রা. বললেন, 'হয়তো সে হত্যা করতে সক্ষম হয়নি।' খারেজি বলল, 'অবশ্যই হয়েছে। কেননা, আলি কোনো দেহরক্ষী রাখেন না।' এরপর মুআবিয়া রা.-এর নির্দেশে তাকে হত্যা করা হয়।

মুআবিআ রা.-এর চিকিৎসার জন্যে ডাক্তার আনা হয়। ডাক্তার জখম দেখে মুআবিয়াকে জানায়—'আপনার জখমে বিষ আছে। এর চিকিৎসায় হয় এখানে উত্তপ্ত লোহার দাগ দিতে হবে; নতুবা এমন একটা তরল ওষুধ পান করতে হবে; যার দ্বারা বিষ নষ্ট হয়ে যাবে। কিন্তু আপনার আর সন্তানাদি হবে না।' মুআবিয়া রা. বললেন, 'আমি আগুনের দাগ দেওয়া কষ্ট সহ্য করতে পারব না। তবে আগামীতে সন্তান না হলেও বর্তমান দুই ছেলে ইয়াজিদ ও আবদুল্লাহকে দেখে আমার চোখ জুড়াবে।'

অবশেষে ডাক্তার তাঁকে তরল ওষুধ সেবন করায়। এর ফলে তাঁর ব্যথা কমে যায়, জখম শুকিয়ে যায় এবং তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে ওঠেন। এ ঘটনার পরে মুআরিয়া রা. মসজিদের মধ্যে নিজের জন্যে একটা সুরক্ষিত কক্ষ তৈরি করেন। সেজদার সময় তাঁর চারপাশে পাহারাদার দণ্ডায়মান থাকত।

আমর ইবনুল আস রা.-কে হত্যা করার দায়িত্ব নিয়েছিল আমর ইবনে বকর। সে-ও নির্ধারিত দিনে ফজরের নামাজে যাওয়ার সময় তাঁকে হত্যা করার উদ্দেশ্য পথে ওত পেতে বসে থাকে। কিন্তু ঘটনাক্রমে ওই সময়

[২২৫] জাহাবি প্রণীত *তারিখুল ইসলাম আহদিল খুলাফাইর রাশিদিন* : ৬৫৪।

আমরের ভীষণ পেটব্যথা হওয়ায় তিনি মসজিদে আসতে পারেননি। তাঁর স্থলাভিষিক্ত করে খারিজা ইবনে হুজাফাকে পাঠিয়ে দেন।

খারিজা ছিলেন বনু আমির ইবন লুওয়াইয়ের লোক এবং আমর ইবনে আসের অন্যতম পুলিশ অফিসার। খারেজি আমর ইবনে বকর তাঁকে আমর ইবনুল আস মনে করে একটিমাত্র আঘাতে হত্যা চূড়ান্ত করে ফেলে। সে বুঝতে পারেনি যে, আমর ইবনে আস রা.-এর স্থলে খারিজা ইবনে হুজাফা নামাজ পড়ানোর জন্য আসছেন।

লোকজন তাকে ধরে ফেলে এবং হজরত আমর ইবনুল আস রা.-এর কাছে নিয়ে যায়। আমর ইবনে বকর লোকজনকে জিজ্ঞেস করল, 'এই লোক কে?' লোকেরা বলল, 'তিনি আমর ইবনুল আস রা.।' সে বলল, 'তাহলে আমি কাকে হত্যা করলাম?' লোকেরা বলল, 'খারিজা ইবনে হুজাফাকে।' সে আমর ইবনুল আস রা.-কে উদ্দেশ্য করে বলল, 'হে ফাসেক, আমি তো ভেবেছি তোমাকে হত্যা করতে পেরেছি।' আমর ইবনুল আস রা. বললেন, 'তুমি আমাকে হত্যার ইচ্ছা পোষণ করেছ, আর আল্লাহর ইচ্ছা ছিল আমার স্থলে খারিজার মৃত্যু।' এরপর তিনি তাকে হত্যা করলেন।[২২৬]

সাত. আলি রা.-এর খেলাফতকাল, তাঁর বয়স ও কবরের স্থান

খেলাফতকাল : খলিফা ইবনে খাইয়াতের ভাষ্য—হজরত আলি রা.-এর খেলাফতকাল ছিল ৪ বছর ৯ মাস ৬ দিন। কেউ কেউ ৩ দিন বা ১৪ দিনও বলেছেন। ৪ বছর ৯ মাস ৩ দিনের বর্ণনাটি অধিক যুক্তিসঙ্গত মনে হয়। কেননা, ৩৫ হিজরির জিলহজ মাসের ১৮ তারিখে তিনি খেলাফতের বায়আত নেন এবং ৪০ হিজরির রমজান মাসের ২১ তারিখে তিনি শাহাদতবরণ করেন।[২২৭]

আমিরুল মুমিমিন হজরত আলি রা.-কে হাসান, হুসাইন ও আবদুল্লাহ ইবনে জাফর রা. গোসল দেন। তিনটি কাপড়ে তাঁকে কাফন পরানো হয়। তাতে কামিস ছিল না। হাসান রা. চার তাকবিরের সাথে জানাজার নামাজ পড়ান।[২২৮] সনদবিহীন এক বর্ণনামতে নয় তাকবিরের কথা বলা হয়।

---

[২২৬] *তারিখে তাবারি* : ৬/৬৫।
[২২৭] *আততারিখ* : ১৯৯; বুখারি প্রণীত *আততারিখুল কাবির* : ১/৯৯ [সনদ বিশুদ্ধ]।
[২২৮] *তাবাকাতে ইবনে সাআদ* : ৩/৩৭; *আলমুনতাজাম* : ৫/১৭৫; *তাবাকাতে ইবনে সাআদ* : ৩/৩৩৭; *আলমুনতাজাম* : ৫/১৭৫।

কবরের স্থান : আমিরুল মুমিমিন হজরত আলি রা.-এর কবর কোথায়—এ ব্যাপারে বিভিন্ন উক্তি রয়েছে। আল্লামা ইবনুল জাওজি রাহ. এ-সংক্রান্ত কয়েকটি বর্ণনা উদ্ধৃত করার পর বলেছেন, এসব বর্ণনার মধ্যে কোনটি সর্বাধিক বিশুদ্ধ সেটা আল্লাহই ভালো জানেন।[২২৯]

এ ব্যাপারে যেসব বর্ণনা পাওয়া যায়, তা হচ্ছে—

- ফজর নামাজ থেকে ফেরার পূর্বে হাসান ইবনে আলি রা. আমিরুল মুমিমিন হজরত আলি রা.-কে কিন্দার সাথে লাগোয়া একটি মাঠের জামে মসজিদের কাছে দাফন করেন।[২৩০]
- আরেক বর্ণনায় এসেছে; কুফার প্রশাসনিক কার্যালয়ের সাথে সংযুক্ত জামে মসজিদের পাশে রাতের বেলা আমিরুল মুমিমিন হজরত আলি রা.-কে দাফন করা হয় এবং তাঁর কবর ঢেকে রাখা হয়।[২৩১]
- অন্য বর্ণনামতে, আমিরুল মুমিমিন হজরত আলি রা.-এর ছেলে হাসান রা. তাঁকে মদিনায় স্থানান্তর করে সেখানে দাফন করেন।[২৩২]
- আরেকটি বর্ণনায় দেখা যায়, কুফার নাজাফ এলাকায় যে কবরকে তাঁর প্রতি সম্পৃক্ত করা হয়, সেটাই তাঁর কবর। কিন্তু কতেক পূর্ববর্তী ওলামায়ে কেরাম; যেমন : কুফার বিচারপতি শুরাইক বিন আবদুল্লাহ নাখয়ি (মৃত : ১৭৮ হিজরি) এবং মুহাম্মাদ বিন সুলাইমান হাজরামি (মৃত : ২৯৭ হিজরি) এই উক্তি অস্বীকার করেন।[২৩৩]

বাস্তবতা হচ্ছে, নাজাফে আলি রা.-এর স্মৃতিস্মারকের অস্তিত্ব উদ্ভাবন করেছে আব্বাসি শাসনামলের রাফেজি প্রশাসক বনুবুইয়া। শিয়া রাফেজিরা চতুর্থ হিজরি শতাব্দীতে নিজেদের অভ্যেসমতে এটা নির্মাণ করে এবং প্রচারণা চালায়। অথচ প্রায় সকল বিশ্লেষক এ ব্যাপারে একমত যে, এটা আলি রা.-এর কবর নয়; বরং মুগিরা ইবনে শুবাহ রা.-এর কবর।

---

[২২৯] *আলমুনতাজাম* : ৫/১৭৮।

[২৩০] *তাবাকাতে ইবনে সাআদ* : ৩/৩৮; আবদুল হামিদ প্রণীত *খিলাফাতু আলি বিন আবি তালিব* : ৪৪১।

[২৩১] *আলমুনতাজাম* : ৫/১৭৭; জাহাবি প্রণীত *তারিখুল ইসলাম আহদিল খুলাফাইর রাশিদিন* : ৬৫৪।

[২৩২] *তারিখে বাগদাদ* : ১/১৩৮।

[২৩৩] আবদুল হামিদ প্রণীত *খিলাফাতু আলি বিন আবি তালিব* : ৪৪১।

ইমাম ইবনে তাইমিয়া রাহ. বলেন,

> 'নাজাফে যে আলি স্মৃতিস্তম্ভ রয়েছে, সে ব্যাপারে ইতিহাসবিদগণ ঐকমত্য পোষণ করেছেন যে, সেটা আলি রা.-এর কবর নয়; বরং মুগিরা ইবনে শুবাহ রা.-এর কবর। কেউই বলেননি এটা আলি রা.-এর কবর। আজ থেকে তিন শতাব্দী পূর্বে আহলে বাইত এমনকি শিয়াদের প্রাধান্য সত্ত্বেও এবং কুফায় তাদের শাসন-ক্ষমতায় থাকা সত্ত্বেও কেউই ওখানে জিয়ারতের ইচ্ছা পোষণ করেনি। তবে আলি স্মৃতিস্তম্ভটি হজরত আলি রা.-এর ইনতেকালের ৩০০ বছর পর অনারব শাসক বনুবুইয়ার শাসনামলে নির্মিত হয়।'[২৩৪]

অন্যত্র তিনি লিখেন—

> 'আলি স্মৃতিস্তম্ভের ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের অভিমত হচ্ছে, সেটা তার কবর নয়; বরং সেটা মুগিরা ইবনে শুবাহ রা.-এর কবর বলে কথিত আছে। আলি রা.-এর ইনতেকালের ৩০০ বছর পর অনারব শাসক বনুবুইয়ার শাসনামলে এর অস্তিত্ব দেখা যায়।'[২৩৫]

আলি রা.-এর শাহাদতের সময় তাঁর বয়স : শাহাদতের সময় তাঁর বয়স কত ছিল—এ ব্যাপারে বিভিন্ন উক্তি রয়েছে। কেউ বলেছেন ৫৩ বছর, কারও মতে ৬৫ বছর, আবার কেউ কেউ ৬৩ বছর বলেও অভিমত পোষণ করেছেন। সর্বশেষ উক্তিটি অধিক বিশুদ্ধ।[২৩৬]

আট. মুসলমানদের ওপর ভ্রান্ত ও বিকৃত ফেরকার কুপ্রভাব

ইসলামি রাজ্যসমূহে ও মুসলিম সমাজে ভ্রান্ত ফেরকা ও বিকৃত দলের উদ্ভবের ফলে ওখানকার অধিবাসীদের মাঝে ভীতির সঞ্চার হয়। ভ্রান্ত ফেরকাগুলো সেখানকার শান্তি-শৃঙ্খলাকে চ্যালেঞ্জ জানায়। সন্দেহ-সংশয় সৃষ্টি করে মানুষের আকিদা-বিশ্বাসে। সেখানকার ভূখণ্ড ফিতনা-ফাসাদ ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে বিষিয়ে তোলে। দীন থেকে বেরিয়ে যাওয়া খারেজিদের এই ছিল অবস্থা। আলি রা.-এর বিরুদ্ধে তারা বিদ্রোহ করেছে। তাঁকে

---

[২৩৪] *আল ফাতাওয়া* : ৪/৫০২; *দিরাসাত ফিল আহওয়ায়ি ওয়াল ফিরাকি ওয়াল বিদআ* : ২৮০।

[২৩৫] *আল ফাতাওয়া* : ২৭/৪৪৬।

[২৩৬] *তারিখে তাবারি* : ৬/৬৭।

কাফের বলেছে। একটু পূর্বেই গত হলো যে, এই দলটি আলি রা.-কে অতর্কিত শহিদ করে ফেলে। আবার এই হত্যাকাণ্ডও তারা এই বিশ্বাস নিয়ে ঘটিয়েছে যে, তারা এতে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করবে। অথচ এটা ছিল সম্পূর্ণরূপে তাদের মনগড়া মতবাদ ও শয়তানের আনুগত্যের বহিঃপ্রকাশ। এর বিপরীতে তাদের কাছে কোনো প্রমাণ ছিল না।

যাইহোক, পূর্বেকার আলোচনা দ্বারা বিষয়টি আমাদের সামনে স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, আলি রা.-এর শাহাদতের সবচে গুরুত্বপূর্ণ কারণ ছিল খারেজিরা। আমরা তাদের চিন্তাধারা ও মন-মানসিকতা সম্পর্কে ধারণা পেয়ে গেছি। সুতরাং তাদের থেকে সাবধান হওয়া আমাদের গোটা মুসলিম জাতির উচিত। তাদের ভ্রান্ত চিন্তাধারা ও অসার মতাদর্শ খণ্ডনে ওলামায়ে কেরাম ও ইসলামের পথে আহ্বানকারীদের যথাযথ দায়িত্ব পালন করা আবশ্যক; যাতে শান্তি-শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা বজায় থাকে। সুন্নাতের আলো উদ্ভাসিত হয়। বেদআতের মশাল নিভে যায়। খুবই উত্তম ও যথাযথ পন্থায় তাদের বিতাড়নের পাশাপাশি আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আকিদা-বিশ্বাস সর্বস্তরে প্রতিষ্ঠা করা এবং বেদআত ও বেদআতিদের শিকড় উপড়ে ফেলা দ্বারা মুসলিম সমাজের সভ্যতা ও সমৃদ্ধি আসবে। উম্মতের নানা প্রভেদকে একতার ছায়াতলে নিয়ে আসাও জরুরি। ইসলামের সুদীর্ঘ ইতিহাস সম্পর্কে যারা অবগত, তারা ভালো করে জানেন—যে শাসকশ্রেণিই সুন্নাতের ওপর অবিচল ছিলেন, কেবল তাঁরাই মুসলমানদের বিশৃঙ্খল পরিস্থিতিকে ঐক্যের প্লাটফর্মে নিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছেন। তাঁদের মাধ্যমে জিহাদ প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। শিষ্টের লালন ও দুষ্টের দমন কার্যকর হয়েছে। প্রাচীন ও আধুনিক—সর্বযুগে তাঁদের মাধ্যমেই ইসলামের মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে।

পক্ষান্তরে যে রাজ্যব্যবস্থা বেদআতের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল, সেখানে মতানৈক্য, দ্বন্দ্ব, বিশৃঙ্খলা, হাঙ্গামা, অন্যায়-অবিচার ও বেদআতের পরিবেশই বিরাজ করেছে। মুসলমানদের ঐক্য টুকরো টুকরো হয়েছে। দ্রুতই তারা হারিয়ে গেছে ধ্বংসের অতলে। তাদের যুগ ফুরিয়ে গেছে।[২৩৭]

---

[২৩৭] আবদুল হামিদ আসসাহিবানি প্রণীত *সিয়ারুশ শুহাদা দুরুসুন ওয়া ইবার* : ৭৭।

নয়. হিংসুক খারেজিদের মনে প্রকৃত মুমিনদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ

হিংসুটে খারেজিদের মনে সত্যিকার মুমিনদের বিরুদ্ধে শত্রুতা, বিদ্বেষ ও হিংসা কী পরিমাণ বেড়ে গিয়েছিল, তার বড় একটি প্রমাণ আবদুর রহমান ইবনে মুলজিমের ওই উক্তি; যেটা সে তার তরবারি সম্পর্কে বলেছিল। সে বলেছে, 'আমি এটা ১ হাজার দিরহাম দিয়ে ক্রয় করেছি। আরও ১ হাজার দিরহাম ব্যয় করে এটাকে বিষমিশ্রিত করেছি। গোটা শহরবাসীর ওপর যদি এর একটি আঘাত পতিত হয়, তবে কেউই প্রাণে বাঁচতে পারত না।'[২৩৮]

নিঃসন্দেহে তার এই উক্তি তাদের অন্তরে গেঁথে থাকা বিদ্বেষ সম্পর্কে আমাদের স্পষ্টভাবে জানান দেয়। এমন হিংসা-বিদ্বেষ তারা কেবল গোটা মুসলিম জাতির বিরুদ্ধেই নয়; বরং স্বয়ং আলি বিন আবি তালিব রা.-এর মতো ইসলামের মহান ব্যক্তির বিরুদ্ধেও লালন করত। অথচ আলি রা. ছিলেন অত্যন্ত দয়ালু ও কোমল স্বভাবের মানুষ।

আমার ভাই, আল্লাহ তোমাদের হেফাজত করুন। এটাও একটু চিন্তা করে দেখুন, কীভাবে এই ভ্রান্ত মতবাদ এবং বিকৃত চিন্তা-চেতনা লালনকারীরা মানুষকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিয়েছে। মুমিনদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছে, আর পৌত্তলিকদের ছেড়ে দিয়েছে।[২৩৯]

দশ. মন্দ পরিস্থিতির প্রভাব

এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, মন্দ পরিবেশ তার অভ্যন্তরে নিঃশ্বাস নেওয়া লোকদেরও গ্রাস করে। যদিও ওই পরিবেশে কিছু নীতিবান লোক থাক না কেন। আপনারা দেখে এসেছেন—ইবনে মুলজিম যখন শাবিব ইবনে বাজরার কাছে গিয়ে বলে, 'তুমি কি দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ লাভ করতে চাও?' সে বলল, 'কীভাবে?' ইবনে মুলজিম বলল, 'আলিকে হত্যা করতে হবে।' শাবিব বলল, 'তোমার মা তোমাকে হারিয়ে ফেলুক! তুমি তো এক বীভৎস কাজের পরিকল্পনা নিয়ে এসেছ। আচ্ছা, কীভাবে তাকে হত্যা করবে—বলো।' ইবনে মুলজিম বলল, 'আমি মসজিদে লুকিয়ে থাকব। তিনি যখন ফজরের নামাজে আসবেন তখন তাকে আঘাত হানব ও হত্যা

---

[২৩৮] *তারিখে তাবারি* : ৬/৬২।
[২৩৯] আবদুল হামিদ আসসাহিবানি প্রণীত *সিয়ারুশ শুহাদা দুরুসুন ওয়া ইবার* : ৭৮।

করব। এরপর যদি বেঁচে যাই তাহলে তো অন্তরে তৃপ্তিবোধ করলাম ও প্রতিশোধ গ্রহণে সক্ষম হলাম। আর যদি মারা পড়ি তাহলে আল্লাহর কাছে যে প্রতিদান পাব, তা দুনিয়ার থেকে বহুগুণে উত্তম।' শাবিব বলল, 'তোমার সর্বনাশ হোক! যদি আলি ব্যতীত অন্য কেউ হতো তাহলে আমার কাছে সহজ লাগত। তুমি তো জানো যে, আলি রা. হচ্ছেন প্রথম সময়ে ইসলাম গ্রহণকারীদের অন্যতম। তিনি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়। তাঁকে হত্যা করতে আমি অন্তরের সাড়া পাচ্ছি না।'

ইবন মুলজিম বলল, 'তোমার কি জানা নেই যে, নাহরাওয়ানে আলি আমাদের লোকদের হত্যা করেছেন?' শাবিব বলল, 'হ্যাঁ, তা করেছেন।' ইবনে মুলজিম বলল, 'তাহলে আমাদের যেসব ভাইদের তিনি হত্যা করেছেন তার পরিবর্তে আমরা তাকে হত্যা করব।' কিছুক্ষণ চুপ থাকার পর শাবিব ইবনে মুলজিমের প্রস্তাবে সম্মতি প্রদান করল।[২৪০]

হে আমার ভাই, আল্লাহ তোমাদের রক্ষা করুন। একটু চিন্তা করে দেখুন, ভ্রান্ত মতবাদ ও বিকৃত চিন্তাধারার ধারকেরা কীভাবে তাদের সঙ্গে চলাফেরাকারীদের ওপর প্রভাব বিস্তার করে। ইসলামে আলি রা.-এর ত্যাগ-তিতিক্ষা ও ইসলামে তাঁর অগ্রগামিতার মতো মর্যাদা ও বাস্তব কীর্তিমালা প্রত্যক্ষ সত্ত্বেও শাবিব ইবনে মুলজিমকে সঙ্গ দিতে প্রস্তুত হয়ে যায়। সে সন্তুষ্ট হতে না পারলে তাকে নাহরাওয়ানের যুদ্ধে নিহতদের দোহাই দিয়ে আলি রা.-এর বিরুদ্ধে প্ররোচনা দেয়। একসময় তার ভেতর জেগে ওঠে প্রতিশোধস্পৃহা। শেষে তার উদ্দেশ্য সাধন হয়। শাবিব তার কথা মেনে নেয়। অথচ নাহরাওয়ানের যুদ্ধে নিহত খারেজিদের হত্যা করা কিছুতেই ভুল ছিল না; বরং তা ছিল সঠিক সিদ্ধান্ত। পরে শাবিব কী পেল? কেবল চিন্তার বিকৃতি, বদনামি আর অশুভ পরিণতি।

এই ঘটনা প্রত্যেক মুসলমানকে এই শিক্ষা দিয়ে থাকে যে, যারাই এ ধরনের বিকৃত চিন্তা, অসার খেয়াল ও ভ্রষ্ট আকিদা লালন করে তাকে বয়কট করা। তার সান্নিধ্য ত্যাগ করা। ওইসব হক্কানি ওলামায়ে কেরামের সান্নিধ্যে থাকা চাই; যারা হক সম্পর্কে সম্যক অবগত। এ লক্ষ্যে তাঁরা কাজ করে যাচ্ছেন। মানুষকে দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণের নির্দেশনা দিচ্ছেন। সুতরাং যে

[২৪০] *তারিখে তাবারি* : ৬/৬২।

মুসলমান এই সরল পথে সন্তুষ্ট হতে পারবে না এবং ভ্রান্ত বিশ্বাসীদের সাহচর্য গ্রহণ করবে; অতিসত্ত্বর সে তিরষ্কৃত হবে। লাঞ্ছনার মুখে পড়বে।[২৪১] আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

﴿وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا *يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا *لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا﴾

'জালেম সেদিন আপন হস্তদ্বয় দংশন করতে করতে বলবে, হায় আফসোস! আমি যদি রাসুলের সাথে পথ অবলম্বন করতাম। হায় আমার দুর্ভাগ্য, আমি যদি অমুককে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করতাম। আমার কাছে উপদেশ আসার পর সে আমাকে তা থেকে বিভ্রান্ত করেছিল। শয়তান মানুষকে বিপদকালে ধোঁকা দেয়।' *-সুরা ফুরকান : আয়াত ২৯।*

এই ছিল রব্বানি আলেম, আল্লাহর ভয়ে জীবন উৎসর্গকারী, তওবায় ডুবে থাকা হেদায়াতপ্রাপ্ত খলিফা আলি বিন আবি তালিব রা.-এর শাহাদতের ঘটনা হতে প্রাপ্ত কিছু শিক্ষা, তাৎপর্য ও উপদেশ। যিনি আমাদের জন্য নেতৃত্বের একটি বরকতমণ্ডিত রাজপথ প্রতিষ্ঠা করে আমাদের সরল পথে তুলে এনেছেন।

বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটি আমি ১১ শাওয়াল ১৪৩৫ হিজরি (৭ আগস্ট ২০১৪ খ্রি.) বৃহস্পতিবার দুপুর ১২টা ৫৫ মিনিটে লেখা শেষ করি। পরিশেষে গ্রন্থ রচনার কাজ শেষে আল্লাহর কাছে দুআ করি, আল্লাহ যেন আমার এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা কবুল করেন। এর দ্বারা তাঁর বান্দাদের উপকৃত করেন। নিজ দয়া-অনুগ্রহে এতে বরকত দান করেন।

﴿مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَّحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا ۖ وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾

[২৪১] আবদুল হামিদ আসসাহিবানি প্রণীত *সিয়ারুশ শুহাদা দুরুসুন ওয়া ইবার* : ৭৯।

'আল্লাহ মানুষের জন্য যে রহমত উন্মুক্ত করে দেন, তা আটকে রাখার কেউ নেই। আর তিনি যা আটকে রাখেন, তারপর তা ছাড়াবার কেউ নেই। আর তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।' *-সুরা ফাতির : আয়াত ২।*

পরম করুণাময় আল্লাহর দয়া-দাক্ষিণ্যতার প্রতি মুখাপেক্ষী হয়ে কম্পিত মনে দুআর হাত তুলছি। তিনিই অনুগ্রহকারী, সম্মানদাতা, সাহায্যকারী ও সুযোগদাতা। সর্বাবস্থায় তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। তাঁর আসমাউল হুসনা ও উন্নত গুণাবলির সাহায্যে নিবেদন করে বলছি—'হে আল্লাহ, এই কাজ দ্বারা আমাকে আপনার সন্তুষ্টি সন্ধানকারী বানিয়ে দিন। আপনার বান্দাদের জন্য এটাকে উপকারী সাব্যস্ত করুন। প্রতিটি অক্ষরের বিনিময়ে আমাকে উত্তম প্রতিদান দান করুন। এটাকে আমার নেকির পাল্লায় রাখুন। ক্ষুদ্র এই প্রচেষ্টা সম্পন্ন করার কাজে আমার যেসব প্রিয়ভাজন সহযোগিতা করেছেন, তাঁদের উত্তম প্রতিদান দান করুন।'

পাঠক ভাইদের কাছেও আমার এই অনুরোধ থাকবে, দুআর সময় আপনাদের এই ভাইয়ের কথা ভুলবেন না।

﴿رَبِّ أَوْزِعْنِيٓ أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِيٓ أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ﴾

'হে আমার রব, তুমি আমার প্রতি ও আমার পিতা-মাতার প্রতি যে অনুগ্রহ করেছ, তার জন্য আমাকে তোমার শুকরিয়া আদায় করার তাওফিক দাও। আর আমি যাতে এমন সৎকাজ করতে পারি, যা তুমি পছন্দ করো। আর তোমার অনুগ্রহে তুমি আমাকে তোমার সৎকর্মপরায়ণ বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করো।' *-সুরা নামাল : আয়াত ১৯।*

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وبِحَمْدِكَ أَشْهدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وأَتُوبُ إِلَيْكَ

وآخِر دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ.

মহান রবের মাগফিরাত, রহমত ও সন্তুষ্টি কামনায়–

আলি মুহাম্মাদ মুহাম্মাদ আসসাল্লাবি